পথের কথা

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী এম, এ
প্রণীত

প্রকাশক :—
মেসার্স আর. সি. দধি এণ্ড কোং
মিহিজাম পোঃ (E. I. R.)

কলিকাতার সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়

[মূল্য বার আনা মাত্র

ভূমিকা

পুস্তকখানি আগাগোড়া এক নিশ্বাসে পাঠ করিলাম ইহাতে বাঙ্গালী যুবকগণ কি করিয়া অন্নসমস্যা সমাধান করিতে পারেন তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার 'Back to the village'—অর্থাৎ পল্লীতে বাস ও সেইখানে থাকিয়া কিরূপভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পথ সুগম করা যায় তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। অনেক পতিত ও পরিত্যক্ত জঙ্গলে যে সোনা-ফলান যাইতে পারে তাহা গ্রন্থকার নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন। এককথায় বলিতে গেলে এই পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষনীয় বিষয় আছে যাহা আমাদের দেশবাসীর বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামে পথ প্রদর্শন করিতে পারে। গ্রন্থকারের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেছি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

সায়ান্স কলেজ,
৩০-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৪

গ্রন্থকারের নিবেদন

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনুপম ভাষায় লিখিয়াছিলেন, "বাঙ্গালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরীতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ী লইয়া চলে না" (চারিত্রপূজা, ৫০ পৃঃ)। তারপর এই চল্লিশ বৎসরে বাঙ্গালী তাহার চরিত্রে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। বাঙ্গালীর প্রতিভা এখন বহুমুখী কর্ম্মের ধারায় প্রতিভাত হইতে উন্মুখ। শ্রদ্ধেয় আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বিপুল কর্ম্মে, অশ্রান্ত লেখনীতে, বক্তৃতায় বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতন কর্ম্মের স্পন্দন আনিতেছেন তাহার প্রেরণা বাঙ্গালীকে সম্পদসৃষ্টির কাজে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এমন দিনে 'পথের কথা'র মত একটি পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি: সেইজন্য ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। দেশবাসীর কাজে ইহা লাগিলে শ্রম সার্থক হইবে।

নিজের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ছাড়া এই পুস্তকে বহু মনীষীর লেখা হইতে, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মূল্যবান প্রবন্ধের অংশ হইতে কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিয়া বইটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে যেখানে যে যে বই বা পত্রিকা হইতে কোন কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সেখানে উল্লেখ করা আছে। এই সূত্রে সেই সব মনীষী লেখক ও সম্পাদক মহাশয়গণকে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'আমাদের অর্থসমস্যা ও কলকারখানা' প্রবন্ধটি ১৩৪০ সনের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং

'জগতের প্রগতি' প্রবন্ধটী ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক 'বসুমতী'তে বাহির হইয়াছিল। 'অমৃত', 'জাগরণ', 'নবশক্তি', 'বিজলী' এই সব পত্রিকায়ও কোন কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়গণকে আমার কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি। এই পুস্তক রচনাকালে কয়েকটি প্রবন্ধ আমার বন্ধু অর্থনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দাস, এম-এ, বি-এল মহাশয় দেখিয়া দিয়াছেন। 'চিনির কথা' অধ্যায়টি লিখিবার সময় আমার আত্মীয় সুগার ইঞ্জিনীয়র ও কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট কতকগুলি তথ্য অবগত হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাণীর একনিষ্ঠ সেবক সুলেখক কবি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাইতেছি।

পরম শ্রদ্ধাভাজন আচার্য্যদেব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি এবং আমার এই পুস্তক প্রকাশ সার্থক হইল। তাঁহাকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী

মিহিজাম,

২১শে পৌষ, ১৩৪১ সাল

সূচী

			পৃষ্ঠা
আমাদের অর্থ-সমস্যা	...	...	১
আমাদের অর্থ-সমস্যা ও গ্রাম	...	...	১৭
ডেনমার্কে সমবায় নীতির সাফল্য	..	..	৪২
ডেনমার্কে পল্লীজীবন	..	...	৪৬
চাষের কথা	...	...	৫১
কলার চাষ	.	. .	৫৭
রেশমের কথা	...	...	৬১
মৎস্য-সমস্যা	...	...	৭১
দুগ্ধ-সমস্যা	...	...	৮১
চিনির কথা	..	..	৮৭
বাঙ্গালীর যক্ষ্মা সমস্যা	...	..	৯১
বাঙ্গলার গ্রাম ও স্বাস্থ্য	...	.	৯৬
আমাদের অর্থ-সমস্যা ও কলকারখানা	...	...	১০১
জগতের প্রগতি	..	...	১১০
আদর্শ ও জগৎ	...	...	১২৩

পরিশিষ্ট—

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ	...	...	৵০
ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী	..	...	।৵০
ব্যাঙ্কিঙের কয়েকটি মূলতত্ত্ব	...	.	।৵০
অর্থনীতির নীতিতে আমাদের উদাসীনতা		.	৸৵০
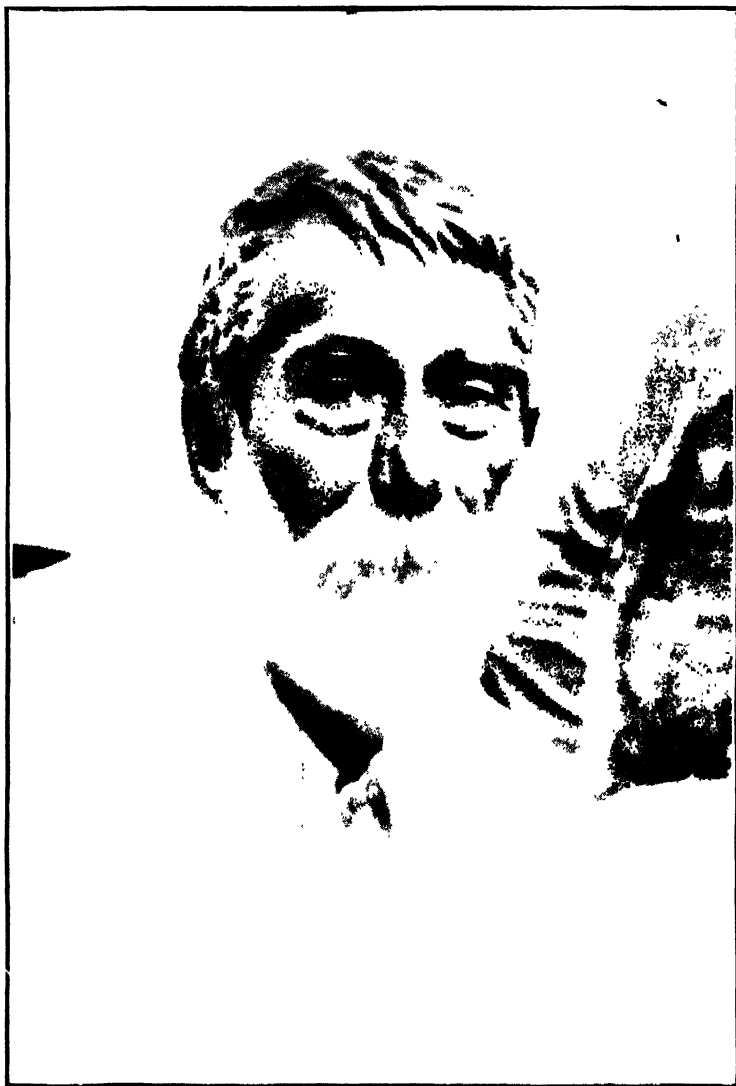
বাংলার গৌরব

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আমাদের অর্থ-সমস্যা

(১)

দারিদ্র্য জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখে। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্য্যে, শক্তিতে সম্পূর্ণ করিয়া জীবনকে গড়িয়া তুলিতে অর্থসম্পদ একান্ত প্রয়োজনীয়। অভাবের পেষণে গুণ বিকশিত হয় না। এজন্য দারিদ্র্যকে গুণরাশি-নাশী বলা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আন্ধ্য, কুষ্ঠ ও দারিদ্র্যকে মহা দুঃখময় বলা হইয়াছে এবং তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য মহাশক্তির আরাধনা ও স্তুতি বহুস্থানে আছে। প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল পরিপূর্ণ জীবন,—ভারতের অর্থসম্পদ তখন ছিল জগতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্ণপ্রসূ ও বীরপ্রসবিনী বলিয়া ভারতমাতার তখন খ্যাতি ছিল।

আজ ভারত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ। ভারতবাসীর আয় পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে কম—ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সম্পদ-শালী দেশের চেয়ে পনের কুড়ি গুণ কম। ভারতের অর্দ্ধেকের বেশী লোক কোনদিন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় ভাবিলে একমাত্র পরাধীনতা এবং বৈদেশিক শোষণকেই ইহার জন্য দায়ী মনে না করিয়া পারা যায় না। রাজনীতিজ্ঞ জন ব্রাইটের (John Bright) উক্তি স্বতঃই মনে পড়ে: "If a country be found possessing a most fertile soil and capable of bearing every variety of production, yet notwithstanding the people are in a state of extreme destitution and suffering, the chances are there is some fundamental error in the government

of that country" অর্থাৎ উর্ব্বরতা এবং সকল রকম জিনিষ উৎপন্ন করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও কোন দেশের অধিবাসীরা যখন নিতান্ত অভাবে ও কষ্টে পড়ে তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, সেই দেশের শাসন ব্যবস্থার মূলেই গলদ আছে।

প্রথমেই চোখে পড়ে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশে আজ রাজকর্ম্মচারীদের বেতন পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের চেয়েই অনেক বেশী; খোদ ইংলণ্ডও তাহার নিজের দেশের শাসন কাজ চালাইতে এত বেতন দিয়া কর্ম্মচারী পোষণ করে না। নিম্নস্তরের কর্ম্মচারীদের বেতনের সহিত উর্দ্ধস্তরের কর্ম্মচারীদের বেতনের এত পার্থক্যও আর কোন দেশে নাই। এই বেশী বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বেশীর ভাগ বৈদেশিক, এবং দেশীয় যাঁহারা আছেন অধিকাংশই ঐ ভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের লব্ধ অর্থও বিদেশে এবং বৈদেশিক বিলাসে ব্যয় হয় বলিয়া সে অর্থ ঘুরিয়া আবার ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি করে না। তাহা ছাড়া, তাঁদের সব আবার পেনসন, ভারতের হিতার্থে ইংলণ্ডকৃত ঋণের সুদ, রেল, খাল খনন প্রভৃতির জন্য লওয়া সুদ, ভারতের জন্য আলাদা অফিসের ব্যয় ইত্যাদিতে Home Charge নাম দিয়া দরিদ্র ভারতকে বৎসরে প্রায় চল্লিশ কোটী টাকা দিতে হয়। অবশ্য অনেক নীতি-শাস্ত্রে অনেক রকমে ইহাকে ভারতের শোষণ (drain) না বলিয়া হিতার্থেই হইতেছে বুঝান আছে। দরিদ্র ভারতবাসী মরমের বেদনায় যাহা বুঝিতেছে তাহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই। অন্য দেশের রপ্তানি (export) আমদানী (import) অপেক্ষা বেশী হইলে সেই দেশের সম্পদ সূচনা করে (যেমন আমেরিকার), কিন্তু ভারতকে রপ্তানি (export) বেশী করিয়া এই Home charge-এর টাকার দায় মিটাইতে হয় বলিয়া তাহার পক্ষে—রপ্তানি বেশী হওয়া সমৃদ্ধির পরিচায়ক নয়। বরং এইজন্য তাহাকে বৎসরে বহুকোটী টাকার বাণিজ্যোপকরণ কাঁচামাল ও খাদ্য শস্য পরকে রপ্তানি করিয়া নিজেকে দরিদ্র কৃষক সাজিয়াই থাকিতে হয়।

বৈদেশিক শাসনের জন্য সামরিক বিভাগেও অতিরিক্ত টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। ভারতকে অকারণে লাখখানেক গোরা সৈন্য পুষিতে হয়। যে সব যুদ্ধোপকরণ এখানে দেশীয় লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারিত তাহা বহু টাকায় বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। সামরিক বিভাগ, বন্দরবিভাগ প্রভৃতির বড় পদগুলিও বৈদেশিকের প্রায় একচেটীয়া। এই সব কারণে এই শাসন ব্যবস্থায় বৈদেশিকের সম্পদ বৃদ্ধির দরুণ ভারতবাসী অপেক্ষা তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি হওয়ায় ভারত রপ্তানি বেশী করিতে বাধ্য হইতেছে এবং ভারতের কাঁচামালের উপর বৈদেশিকেরই কর্ত্তৃত্ব বাড়িতেছে।

এই বৈদেশিক শাসনের প্রভাব দেশীরাজ্যগুলিতেও সংক্রামিত। প্রজার কষ্টার্জ্জিত সম্পদ আহরণ করিয়া তাঁহারা ব্যয় করিতেছেন গিয়া বিদেশে এবং বিলাসে। মেঘ যেমন চারিদিক হইতে বিন্দু বিন্দু জলকণা আহরণ করিয়া পুনরায় পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া দিয়া শস্য-সম্পদ ও শান্তির সৃষ্টি করে, তেমনি রাজার দেশশাসনও তখনই সার্থক হয় যখন চারিদিকের অর্থ-সম্পদ তাঁহার ভিতর দিয়া আবার সেই দেশেরই ভিতর উপচিত হইয়া নানা কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু আজ তাঁহারা হইয়াছেন ভারতের অর্থসম্পদ বিদেশে ছড়াইবার অন্যতম যন্ত্রবিশেষ। কোটী কোটী টাকা তাঁহারা বৎসরে বিদেশে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। সে দক দিয়াও ভারতের জিনিষের উপর বৈদেশিকের ক্রয়ক্ষমতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইতেছে এবং নিজের উৎপন্ন জিনিষের উপর ভারতবাসী আয়ত্ত (control) হারাইয়া অদ্ধাশনে কাল কাটাইতেছে।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। সেই কৃষির অবস্থা আজ শোচনীয় হইয়াছে। রাশীয়া, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের একবিঘাতে যে গম উৎপন্ন হয় ভারতের তিন বিঘাতেও তাহা হয় না। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের এক বিঘা আখে যে গুড় বা চিনি হয় ভারতের চারবিঘাতেও তাহা হয় না। আমেরিকার এক বিঘাতে যে তুলা হয় ভারতের দুই বিঘাতেও তাহা হয় না, ইজিপ্টের

এক বিঘাতে যে তুলা হয় ভারতের চার বিঘাতেও তাহা হয় না। বাংলার বিখ্যাত ধানের জমির ফলন জাপানের চেয়েও কম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ অর্থ ও শিক্ষার অভাবে ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে কৃষির উন্নতি করিতে পারিতেছে না। 'ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলী ভবন্তি'—দুঃখ একবার আরম্ভ হইলে চারিদিক হইতে জড়াইয়া ধরে। কৃষকের এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সুযোগে মহাজনের ঋণ তাহাকে জগদ্দল পাষাণের মত চাপিয়া ধরিয়াছে,—কোনদিন যে আবার এই সুদের জাল এড়াইয়া সে মানুষের মত পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইবে, তাহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে তাহার কোন আভাষও পাওয়া যায় না। কোটী কোটী টাকার সরিষা ও তৈলবীজ বৎসরে বিদেশে রপ্তানি হয়; তাহার খইল ভারতের ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পায় না। কোটী কোটী টাকার হাড় প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া চলিয়া যাইতেছে,—বিদেশের জমি আমাদের হাড়ে উর্ব্বরা হইতেছে, আর দিনের পর দিন ভারতের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া যাইতেছে। খইল গরুর একটী প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য, তাহা হইতে ভারতের অধিকাংশ গরু বঞ্চিত। হাড়সর্ব্বস্ব গরু লইয়া ভারতের কৃষক কোনরূপে লাঙল ঠেলিয়া যাহা উৎপন্ন করে উদ্যমশীল জগতের বাজারে তাহা একান্ত নগণ্য।

কথা হইতে পারে, কেন আমরা তো সরিষা প্রভৃতি কাঁচামাল এবং হাড় আমাদের দেশে রাখিয়া ভারতের ভূমিকে এই অবনতি হইতে মুক্ত রাখিতে পারি। কিন্তু তাহা পারিতেছি না, কারণ আমাদিগকে এই ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থার বৈদেশিক ব্যয় বহুকোটী টাকা Home charge দিতে হয়, আর আমাদের নিজস্ব জাহাজ না থাকায় এই মাল আমদানী রপ্তানির জাহাজ ভাড়া বাবদ অনেক টাকা বিদেশীকে দিতে হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতায় অবাধ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন না থাকায় বিদেশের বাজারে রূপার দাম প্রায়ই পড়িয়া গিয়া বিনিময় বা exchange-এ ভারতকে অনেক বেশী টাকা বিদেশীকে দিতে হয়। এই সকল অতিরিক্ত চাহিদা (যাহা অসনব্যবস্থার আমাদের উপর হাত না থাকায় হইতেছে) মিটাইতে আমরা

সরিষা, হাড়, পাট, ধান, গম প্রভৃতি অতিরিক্ত মাত্রায় রপ্তানি করিতে বাধ্য হই। এবং রপ্তানির আধিক্য আমাদের পক্ষে সম্পদের পরিচায়ক না হইয়া দারুণ দুর্ভাগ্যের সূচক হইয়াছে। এদিকে দিন দিন ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কমিয়া আসিতেছে; কাজেই অবস্থা এমন দাঁড়াইতেছে যে, যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও বুঝি আমরা বৈদেশিকের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারিব না।

জগতের বাজারে পাটের চাহিদা একশত কোটী টাকার উপর। পাট বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও হয় না। এবং তাহা ছাড়া সমগ্র জগতে পাট হইতে যে সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহারও দুই-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালার পাটকল গুলিতেই প্রস্তুত। এমন একটী বাণিজ্যগত সুবিধার অবস্থা বাংলার মত উর্ব্বর কোন স্বাধীন দেশের হইলে সেই দেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীদেশ না হইয়া পারে না। কি করিয়া এই পাটের উপযুক্ত লাভ কৃষক পাইতে পারে, কি করিয়া পাটের দর এবং পাট হইতে উৎপন্ন জিনিষের দরের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ ঘটিয়া একদিকে কৃষকের দারুণ দুরবস্থা ও অন্যদিকে পাটকল-ওয়ালাদের অতিরিক্ত লাভের সৃষ্টি না করে, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর ভাবিবার বিষয়। এবং এ সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা হওয়া দরকার। *

দেশের বনভূমি মেঘ আকর্ষণ করিয়া বারিপাতের সাহায্য করে এবং অতিরিক্ত জলধারাকে আটকাইয়া রাখিয়া হঠাৎ জলপ্লাবন হইতে নিম্নস্থ কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি রক্ষা করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের অমনোযোগিতায় ও অজ্ঞতায় ক্রমাগত যথেচ্ছভাবে বন কাটা পড়ায় ভারতের অনেক স্থানে বিশেষতঃ বাংলায় যে কৃষির বিশেষ ক্ষতিকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা পর পর কয়বারের অতিরিক্ত বন্যা এবং বারিপাত পূর্ব্বের মত উপযুক্ত ভাবে না হওয়া হইতে অনেকটা বুঝা যায়। সুখের বিষয়, এদিকে কর্ত্তাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং বন রক্ষার ভাল ব্যবস্থা হইতেছে আশা করা যায়। কিন্তু ভারতবাসীর বনবিভাগের সমস্ত উচ্চ পদগুলি লাভ করিতে পারিবার ব্যবস্থা না হওয়ায় এবং বনবিভাগের আয়কর সম্বন্ধে নূতন তথ্য

* পরিশিষ্টে—'পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ' দ্রষ্টব্য।

গবেষণা দ্বারা বাহির করিবার পক্ষে ভারতবাসীর উপযুক্ত ক্ষেত্র না থাকায় এই বিভাগ হইতে ভারত সমৃদ্ধ হইতে পারিতেছে না।

উপযুক্ত সেচের খাল খনন করিতে পারিলে যে অনেক অনুর্ব্বর যায়গাকে বেশ শস্যসম্পদশালী করিয়া তোলা যায় তাহা সিন্ধু দেশ, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যে যে কয়টী বিস্তৃত খাল খনন করা হইয়াছে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতকটা যায়গার বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে বেশ বুঝা যায়।* কিন্তু এই ধরণের কাজ গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত টাকার অভাবে নাকি তেমন অগ্রসর হইতেছে না। দুই একটা কমিটী বসাইয়া মাঝে মাঝে যখন অতিরিক্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বেতন সওয়াগুণ দেড় গুণ বাড়াইয়া দেওয়া হয় তখন তাহা কোনদিন টাকার অভাব বলিয়া অবশ্য আটকায় না। অথচ অর্থের অভাবের দোহাই দিয়া

* এই খাল খননের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় কিন্তু বলেন উহা ল্যাঙ্কাশায়ার-এর বস্ত্র ব্যবসায়িগণের স্বার্থ রক্ষার্থই পরিকল্পিত হয় :—

"Bengal being a permanently settled province the Government is assured of the fixed land revenue and there is no chance of its being enhanced on account of the increased yield of the soil due to irrigation and hence it has been relegated to criminal neglect. The welfare and prosperity of the people do not count a feather's weight in the scale, in the scheme of our beneficent Government. In marked contrast with this policy of laissez faire is the policy of over-activity in this respect in the arid regions of Sind. The Sukkur Barrage project which will irrigate a vast area is calculated to cost twenty crores. No doubt the scheme is expected to make an appreciable addition to the production of food supply (notably wheat) but the policy underlying this colossal project is evidently the consideration that the new area to be brought under cultivation is eminently fitted for the cultivation of long-stapled cotton. Lancashire is anxious to be independent of America in this respect; hence the tightgrip over Sudan and enormous expenditure of the Indian tax-payers' hard-earned money. Here again Imperial considerations play a prominent part." Life and Experiences of a Bengali Chemist. (Pages 415-16).

এদেশ বাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি যেভাবে অবজ্ঞাত হয় এমন কোন দেশের শাসন ব্যবস্থায় দেখা যায় না।

ভারতের অনেক প্রদেশে বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশ এবং বাংলাদেশে ঘন বসতি বলিয়া চাষের জমি লোকসংখ্যার অনুপাতে অধিক নয়; এজন্য এক্ষণে extensive cultivation বা বিস্তৃত আবাদের সুবিধা এখানে তেমন না থাকায় intensive cultivation বা অল্প জমিতে যাহাতে বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় সেই বিষয়েই দেশবাসীকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আবাদ দ্বারাই সম্ভব। এই বিষয়ে যথোচিত অনুশীলনের জন্য ভাল অর্থাৎ বেশ কার্য্যকরী কৃষি-বিদ্যালয় দেশের স্থানে স্থানে পল্লীতে স্থাপন করিয়া যথেষ্ট যুবক যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া মাটীর বুকে 'সোণা' ফলাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর মিলিত হইয়া এখনই করা দরকার—কৃষি-মন্ত্রী আর বেতনবহুল কৃষিবিভাগ দেশের সম্পদ সৃষ্টি করিবে না।

কোন দেশের লোককে যদি কৃষিকেই জীবনের প্রধান উপজীবিকা করিতে হয় তবে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির সময় তাহার দারুণ দুর্গতি ঘটে এবং কৃষির সহিত বাণিজ্যের যোগ না ঘটায় তাহাকে পরমুখাপেক্ষী ও ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতে হয়। কৃষি কখনও সকল প্রকৃতির লোকের অবলম্বন হইতে পারে না। তাহা হইলে, অনেক লোক বাধ্য হইয়া বেকার হইয়া পড়ে। ভারত কোনদিন এখনকার মত কৃষিসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে নাই। ভারতের কার্পাস শিল্প এবং পশম ও রেশম শিল্প একদিন জগতপ্রসিদ্ধ ছিল। ভারতের নিজস্ব জাহাজ ছিল, * তাহাতে করিয়া নিজ প্রয়োজন মিটাইয়াও ভারতবাসী দেশ বিদেশে চালান দিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিত। জগতে আমেরিকা, ইজিপ্ট এবং ভারত তুলা উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র।

---

* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার অমূল্য পুস্তক Life and Experiences of a Bengali Chemist-এ সংক্ষেপে অথচ নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের অমনোযোগিতায় এবং অবহেলায় ও বৈদেশিক অসম প্রতিকূলতায় কি করিয়া ভারতের এই

অথচ এই ভারতকে আজ প্রায় ৭০।৭৫ কোটী টাকার বিদেশী বস্ত্র আমদানী করিতে হইতেছে। কি করিয়া ভারতের এই প্রধান শিল্প ধ্বংস হইল সেই দুঃখময় কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক তাঁতিদের উপর অবৈধ অত্যাচার, নানারূপ অন্যায় শুল্কের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। সে সময় বাধ্য হইয়া কত তাঁতি তাঁত ছাড়িয়া চাষী হইয়া পড়ায় কৃষি জমির উপর বিষম চাপ পড়িয়া দেশের দারুণ আর্থিক অবনতি ঘটে।

তাহা ছাড়া বিপুল এবং বিশৃঙ্খল একটী ধনীদেশ অভাবনীয়রূপে হাতে আসিয়া পড়ায় নানা উপায়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা ইংলণ্ডে বিপুল ধন লইতে পারায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য এবং শিল্প প্রসারের অনেক মূলধন লাভ হয়। যাঁহারা বলেন যে বাষ্পীয় শক্তি (Steam power) এবং কলকব্জার উন্নতিতেই ইংলণ্ড এত সমৃদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের উক্তি ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে Prof. H. S. Chatterji তাঁহার সুন্দর ও সরলভাবে লিখিত পুস্তক 'Indian Economics'-এ কয়েকজন খ্যাতনামা লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—'Mr. Arnold Toynbee, the great authority and an impartial writer of history of the Industrial Revolution in England, says, "English industries would not have advanced so rapidly without protection, but the system once established

---

নিজস্ব জাহাজ ধ্বংস হইল। (Pages 347—360)। সকলেরই উহা পাঠ করা উচিত। শেষের দিকের মন্তব্যের ২।৪ লাইন তুলিয়া দিলাম,—

"The British Government, it will thus be seen, has done everything in its power to ruin the indigenous enterprise." . . . . "It has been calculated that during the last 25 years, more than 20 Indian Shipping Companies, with a capital aggregating more than 10 crores, have tried to establish themselves on the Indian coast; and most, if not all of them, have failed owing to the rate-cutting policy adopted by the British Concerns."—P. 358.

led to perpetual wrangling on the part of rival industries and sacrificed India and the colonies to our great manufacturers." Brooks Adams and Mr. Cunningham even go so far as to proclaim that mechanical inventions would not have been of any avail if Capital was not forthcoming and this Capital was supplied to England by Bengal. Mr. R. C. Dutt says, "British manufactures were imported into Calcutta on payment of a small duty of 2½ per cent while the import of Indian manufactures into England was discouraged by many duties ranging up to 400 per cent on their value." So, we may conclude, a prohibitive, destructive, and discouraging policy led to a revolution in the nature of Indian exports and imports.'

স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বস্ত্র শিল্পের এই অবনতির স্রোত কিছু কিছু ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৯০০-৩০ সালের মধ্যে বম্বে এবং অন্যান্য প্রদেশে কতকগুলি কাপড়ের কল দেশীয় মূলধনে স্থাপিত হইয়া বস্ত্রের ব্যবসায় দেশে ক্রমে প্রসারিত হইতেছে কিন্তু এখনও ৭০।৮০ কোটী টাকার বস্ত্র ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় পরমুখাপেক্ষী থাকায় ভারতকে কিরূপ বস্ত্রের দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। ভারতকে স্বরাজ এবং সমৃদ্ধি লাভ করিতে হইলে তাহার বিদেশী বস্ত্র আমদানী বন্ধ করিয়া লুপ্ত বস্ত্র-শিল্পের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। চরকাদ্বারাই হউক, বা স্বদেশী মিল স্থাপনের দ্বারাই হউক যাহাতে ইহা সম্ভবপর হয়, সর্ব্বতোভাবে সকলের তাহা করা উচিত।

রিপোর্টে যদিও দেখা যায় যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে (industry) বাংলার সম্পদ খুব বেশী এবং প্রচুর আয়কর (income-tax) ও শুল্ক (duty) সেইজন্য এখানে পাওয়া যায় তাহাতে বাঙ্গালীর পুলকিত হইবার কিছুই নাই। কারণ তাহা হইতেছে গঙ্গার দুইধারের বৈদেশিক বণিকের চটকল বা পাটকলগুলির বিপুল লাভ এবং জলপাইগুড়ি এবং আসামের চা বাগিচার লাভ যাহার বেশীর ভাগই বৈদেশিকের। আসানসোলের নিকট কুলটীর এবং হিরাপুরের বিরাট লৌহ কারখানা দুইটাই বৈদেশিক কোম্পানীর। কয়লার খনি, লোহার খনি, অভ্রের খনি, পেট্রোলের খনি, সোণারূপার খনি, ম্যাঙ্গানীজের খনি সবই ভারতে স্থানবিশেষে আছে; কিন্তু তাহা কাজে লাগাইয়া সম্পদশালী হইতেছে বিদেশের বণিক আর আমরা তাহাতে কুলীগিরি এবং কেরাণীর কাজ করিতেছি। আমাদের দেশের যে মাড়ওয়াড়ী ও ভাটিয়া বণিকের সমৃদ্ধি দেখিতেছি তাহা দেশের সম্পদের সূচক নয় কারণ তাহা শুধু বিদেশী বণিকের আমদানী রপ্তানির দালালী করিয়া। ইহা যেন ক্রমবর্দ্ধমান দরিদ্র দেশের ধন যেখান দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায় তাহার স্থানে স্থানে ২।৪টা গর্ত্ত হইয়া জল জমিয়া থাকার মত,—তাহাতে ধনের অস্বাস্থ্যই সূচনা করে।

আমাদের দেশে যে সব শিল্প এবং কলকব্জার কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা আছে তাহাতে বিদেশী জিনিষেরই প্রচারের সুবিধা মাত্র হইতেছে! এই সব প্রতিষ্ঠান দ্বারাও দেশের সম্পদ প্রকৃতপক্ষে বাড়িতেছে না। যেমন হোসীয়ারীর কাজ শিখিয়া বিদেশী কলকব্জা আনিয়া বিদেশী সুতায় যে গেঞ্জি হয় তাহার নামমাত্র সম্পদ দেশের। মোটর এবং বৈদ্যুতিক কলকব্জার কাজ শিখিয়া শুধু সেইগুলি মেরামত প্রভৃতি ভারতবাসীর দ্বারা সুলভে হইতে থাকায় ঐ সব বিদেশী জিনিষের ভারতে প্রচারেরই মাত্র সুবিধা হইতেছে। ডাক্তারীতেও দেখি অধিকাংশ বিদেশী পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতির প্রচারেরই সুবিধা হইতেছে। শিল্প এবং কলকব্জা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির সার্থকতা হইত—যদি এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত যে,

ঐ সমস্ত জিনিষ দেশেই তৈরী করিবার জন্য ভারতীয় যুবক উদ্বুদ্ধ হইতে পারিত এবং এই বিষয়ে গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইত।

মান্দালয় কৃষি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ তাঁহার "বাঙ্গালার সমস্যা"য় লিখিয়াছেন:—"জাপান ও ইংলণ্ডে টেলিগ্রামের থামগুলি কাঠের। কিন্তু আমাদের দেশে এই সমস্তই লোহার, সেগুলি তৈয়ার করিয়াছে—বিলাতের কারিগর। অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিষও আমাদের দেশে ক্রয় করা হয় বিলাতী কারিগরের কাজ যোগাইবার জন্য। আর আমাদের দেশের লোক কার্য্যের অভাবে অর্দ্ধভুক্ত বা অভুক্ত থাকে"। (পৃঃ ২৯)

যেদিক দিয়াই দেখি বৈদেশিক প্রভাবে এবং পরাধীনতার বিষম চাপে আমাদের অর্থ-সমস্যা অন্ধকারময় ও জটিল। আমাদের জীবন দারিদ্র্যের কঠোর পেষণে এই জন্য দিন দিন পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। আমাদের নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং প্রতিকারের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্র হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে।

(২)

শুধু রাষ্ট্রের বাধাই আমাদের অর্থসমস্যার পথে গুরুতর অন্তরায় হইলেও তাহাই দেশের একমাত্র আর্থিক দুর্গতির কারণ নহে। শুধু একদিক দেখিলেই চলিবে না কিংবা গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদিগকে চিরকাল যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হইবে। আগে কোথায় কি গলদ আছে, সে সমস্ত অবস্থা যতদূর পারা যায় ধীরভাবে বুঝিতে হইবে। তারপর সাধ্যমত প্রতীকারে যত্নবান হইতে হইবে।

আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রে, জলবায়ুর গুণেই হোক্ কি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের অধিবাসী বলিয়াই হোক্, এমন একটা

আরামপ্রিয় শ্রমবিমুখতার ভাব আছে যাহা অর্থসাধনার অনুকূল নহে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় বাঙ্গালীকে সচেতন করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেছেন। আমি বলি না বাঙ্গালী মাড়ওয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটি কিংবা দিল্লীওয়ালা হউন। বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য এবং উচ্চতর জ্ঞান কলাশিল্প, কাব্য, সাহিত্য, সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অনুশীলন বাদ না দিয়াও বাঙ্গালী অর্থ অনুশীলনের ক্ষেত্রে এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য এই আরামপ্রিয়তাকে পরিহার করিতে পারে। সাধারণতঃ স্বল্পে পরিতুষ্ট হওয়া, কোন রকমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার (low standard of living) ভাব পোষণ করা হইতে এই সব অলসতা আসে। এই জগৎ ভগবানের জগৎ, অতুল সম্পদ, ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া ইহাকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার অদম্য প্রেরণা অন্তরে জাগাইতে হইবে। তামসিক জড়তায় না আছে ধর্ম্ম, না আছে অর্থ, না আছে মোক্ষ।

আরামপ্রিয়তার অনুসঙ্গী আর একটী প্রধান দোষ হইতেছে, গোঁজামিল দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা এবং ফাঁকি দিবার প্রয়াস। কুশলী এবং নিপুণ হইয়া অবিরাম চেষ্টা করিয়া কোন জিনিষকে ক্রমাগত সম্পূর্ণতার দিকে নিয়া যাওয়ার চেষ্টা বড় দেখা যায় না। ইংরেজদের যেমন পিয়ার্স সাবান, হাণ্টলিপামারের বিস্কুট, লিপটনের চা, কিংবা ক্রপ কি বাটলারের ক্ষুর নিপুণ চেষ্টায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়া জগতের বাজারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে আমাদের সেই রকম অবিশ্রান্ত চেষ্টায় একটা জিনিষকে যতদূর ভাল করা যায় তার দিকে লক্ষ্য নাই। ফাঁকি দিয়া নকল করিয়া যদি কাজ সারিতে পারি সেই দিকেই অনেকের লক্ষ্য। একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের দেশে বড় বড় নার্শারীম্যান এবং গোলাপ ফুলের ব্যবসায়ী কত আছেন। কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকার উদ্যোগী পুষ্প-ব্যবসায়ী কৃত্রিম উপায়ে রেণু সংমিশ্রণ (hybridisation) দ্বারা নিত্য নূতন কত যে সুন্দর সুন্দর অপরূপ বর্ণ ও আকারের গোলাপ সৃষ্টি করিয়া

জগতের সৌন্দর্য্য সম্পদ বাড়াইতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সব দেশে প্রকাশিত "Rose Annual" এ সকলের অনেক আলোচনা আছে। ভারতে বিশেষ করিয়া সাঁওতাল পরগণায় গোলাপের নূতন জাতি সৃষ্টি করার পক্ষে (hybridisation-এর) ও-দেশের চেয়ে অনুকূল আবহাওয়া আছে এবং চেষ্টা এবং যত্ন থাকিলে আমাদের দেশের নার্শারী-ম্যান মহাশয়েরা তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা শুধু সেখান হইতে উহাদের আবিষ্কৃত গাছ কিনিয়া আনিয়া কলম করিয়া বিক্রী করিয়া বড় লোক হইতে চান। নূতন নূতন সৃষ্টির আনন্দগর্ব্ব হইতে তাঁহারা এজন্য বঞ্চিত ; আর গোলাপের বাজারেও আমাদের দেশের এজন্য কোন স্থান নাই।

আরামপ্রিয়তার আর এক অনুসঙ্গী, সহজে বড়লোক হইবার আকাঙ্ক্ষা। ইহা মানুষকে অনেক সময় ফাঁকীর পথে প্রবৃত্ত করে। লিমিটেড কোম্পানী করিয়া share-এ ব্যবসা ফাঁদিয়া মাঝ হইতে একহাত মারিবার চেষ্টা হয়। "গড্ডলিকা"-তে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডে'র যে চিত্র আছে তাহা কৌতুককর হইলেও প্রণিধানযোগ্য। একে আমাদের দেশে যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহাদের টাকা জমানই অভ্যাস, আর না হয় তো সুদে খাটাইয়া নিশ্চিত লাভের মধ্যে আরামের দিন গুজরাণ করার চেষ্টা ; তারপর যদি দুই চার জনে মাঝে মাঝে লিমিটেড কোম্পানী করিয়া এইরূপে ফাঁকীর নমুনা দেখান তবে দেশের বিপুল সম্পদ সৃষ্টির জন্য সমবেত চেষ্টায় যে বড় বড় কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে তাহার টাকা আসিবে কোথা হইতে? এঁদের ফাঁকীতে শুধু জনকতকই প্রতারিত হন না, সমগ্র দেশেরই ইহাতে অকল্যাণ। মনে প্রাণে কর্ম্মে সততাদ্বারা এবং কুশলী হইয়া আন্তরিক যত্নে যখন আমরা সম্পদ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিব তখন দেশের লোক ভরসা পাইবে এবং আমাদের কাজে সহায় হইবে। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেন, "আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে টাকার অভাব তত নয় যত উপযুক্ত মানুষের অভাব" (অন্নসমস্যা—প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৬)।

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'প্রবাসীতে' 'উদ্যোগশিক্ষা' প্রবন্ধে আমাদের বুদ্ধি কি রকম গতানুগতিক ও নূতন কিছু করিতে অপারগ তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে শান্তিনিকেতন আশ্রমে নূতন নূতন উন্নতিশীল প্রণালী প্রবর্ত্তনে এই জড়তা ও গতানুগতিকের জন্য তিনি কিরূপ বাধা পাইয়াছেন। আশ্রমে কতকগুলি মূলতানী গরু কেনা হইয়াছিল। একজন হিন্দুস্থানী গোয়ালা এই গরুগুলি দোহাইত। ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত গরু দোহা শিখাইবার অনেক চেষ্টা হয়, কিন্তু সেদিকে বাঙ্গালী ছাত্রেরা ঘেঁষিত না। হিন্দুস্থানী গোয়ালা দিয়াই দুধ দোহাইতে হইত। রান্না ঘরে উন্নত প্রণালীর চুলা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু অভ্যাসের জড়তাবশতঃ পাচকগণ উহা ব্যবহার করিত না। মনের এই নির্জ্জীবতা আর কোন দেশে দেখা যায় না। এখানে তাঁহার অমূল্য বাণী কিছু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—"দেহের পুষ্টিও আমাদের নাই, অন্নের অভাবও আমাদের নিত্য লাগিয়া আছে, অথচ যখনই সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করি তখনই পুরাণো রাস্তা ছাড়া অন্য পথ চোখেই পড়ে না। সে পথ দুর্গম হইয়া উঠিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই দিকেই মন যায়। যাহা কিছু চলিয়া আসিতেছে তাহা নিঃসন্দেহেই ভাল বলিয়াই চলিয়া আসিতেছে, এই জড় বিশ্বাস আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন হইতেও কিছুতেই তাড়ানো যায় না। সকল সভ্য দেশেই আরো ভাল রাস্তায় লোক চলিতেছে, আমাদের দেশে সে রাস্তা বন্ধ। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, এদেশের যাহা কিছু পরিবর্ত্তন প্রায় সমস্তই বাহিরের তাড়নায় হইতেছে ; তাহাতে আমাদের অন্তরের সম্মতি নাই। ইহা আমাদের অন্তরতম দাসত্বেরই লক্ষণ।" * * "পড়াশুনার ত্রুটীকেই আমরা একমাত্র ত্রুটী মনে করি, কেন না সেটা আমাদের বাঁধা অভ্যাস। উন্নতির যে অন্ত নাই এবং সকল বাধাকেই যে অতিক্রম করিতে হইবে, এই বিশ্বাস ও ভরসা না থাকিলে কেবল বই পড়িয়া আমরা বাঁচিব না।"

আর একটী ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে—বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক কাজে অনেক সময় অযথা অধিক ব্যয় করিবার প্রথা। এ সব কাজে নির্দ্দিষ্টভাবে অবস্থা বুঝিয়া নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করা ও পরিমিত ব্যয় করা ভালই। কিন্তু তাহাতো বড় হয় না। সমাজ এবং প্রথার বশে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় হয়। বিবাহের সময় কত সংসারে এজন্য ঋণের বোঝা চাপে। ঋণের সুদ আর আসল শোধ দিতে দিতে গৃহস্থকে প্রাণান্ত হইতে হয়। যে উদ্বৃত্ত অর্থ মানুষ নূতন সম্পদ সৃষ্টির কাজে খাটাইবে তাহা আর তখন জোটে না। এই প্রসঙ্গে পণপ্রথার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য,—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্', যার যার খরচপত্র অবস্থামত নিজে নিজে করা উচিত। উল্কো পাওনা আদায় করে উড়োনোটা কিছু নয়।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু কৃষকের জমির উপর অনেক জায়গায় এমন স্বত্ব নাই যাহার দ্বারা সে জমির উন্নতি করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। অর্দ্ধেক চাষা বর্গাভাগে চাষ করে। আর অর্দ্ধেকের মহাজনের ঋণে আর সুদের ভারে এমন জর্জ্জর অবস্থা যে তাহারও দৃষ্টিতে অদূর ভবিষ্যতে ঐ বর্গাভাগেরই চিত্র ভাসিতেছে। জমিকে নিজের মত করিয়া দেখিবার প্রেরণা না থাকায় উন্নতিরও চেষ্টা নাই। আছে অবসাদ; কোনরূপে দিন গুজরাণ করিবার ভাব। অভাবের পেষণে এবং শিক্ষার অভাবে উচ্চতর স্বচ্ছন্দতর জীবন যাপনের (high standard of living-এর) কোন প্রেরণাও নাই।

ডেনমার্কের মত দেশ, যেখানে কৃষির কোন অনুকূল অবস্থা নাই, সেখানে শিক্ষা, সমবায়নীতি (co-operative system) এবং জমির উপর কৃষকের স্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় অপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে কিছুদিন আগে "Amrita Bazar Patrika"-তে (April 16, 1933) শ্রীযুত নিত্যনারায়ণ ব্যানার্জ্জী (লাবপুর, বীরভূম) Why Danish Farming Pays প্রবন্ধে * যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিছু

* Modern Agriculture নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—'In Denmark they have industrialised the agriculture or in other words they transform the raw agricultural products into industrial goods'. শিক্ষা ও ব্যবহারগুণে সেখানে কৃষিজাত জিনিষ বাহিরে চালান না দিয়া দেশেই সেগুলি হইতে তদপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। এমন কি ডাল প্রভৃতি যখন খুব সস্তা হয় তখন বাহিরে সে সব চালান না দিয়া গরু মুরগীদের খাওয়াইয়া দুগ্ধ, ডিম, পনীর, মাখন এইসব প্রচুর মূল্যবান সম্পদে পরিণত করা হয়। এতেও হতো না যদি সেখানে সমবায়নীতির প্রসার না হতো। "It would not be possible for Denmark to push ahead amidst the keen continental competition, even with industrialised agriculture, with so many small farms, as it is there, had not there been the world-renowned co-operative method." তারপর সেখানে কৃষকের জমির স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। "There are to-day in Denmark more than 20,000 independent freeholds, the owners of which are not tenants under anybody." আরো বিশেষ কথা, রাষ্ট্র বা গভর্ণমেণ্টই সেখানে কৃষককে এই স্বাধীন প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন—"These freeholds are the creation of the State."

সর্ব্বাগ্রে দরকার, সাধারণ ভাবের লেখা পড়া (Primary Education) সকলকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা। তাহা হইলে অন্যান্য অর্থনীতির অনুকূল আয়োজন সহজ হইবে। নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার প্রেরণায় সকলে যাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে তাহা দেখিতে হইবে। ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও স্বচ্ছন্দময় জীবন যাপনের (High standard of living এর) অভীপ্সা (aspiration) সমগ্র দেশময় জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই অদম্য কর্ম্মস্পৃহা ও কুশলী দৃষ্টি জাগিবে।

আমাদের অর্থ-সমস্যা ও গ্রাম

(১)

অর্থ-সমস্যার প্রধান বিষয় হইতেছে দুইটা। প্রথমতঃ দেশের অর্থ বৃদ্ধি করা; দ্বিতীয়তঃ সেই অর্থের বণ্টন বা ভাগ যাহাতে ঠিকমত হইয়া সকলকে সমৃদ্ধ করিতে পারে তাহার উপায় করা।

অর্থ বলিতে আমরা সাধারণতঃ টাকা পয়সা বুঝি। কিন্তু দেশের আসল অর্থ হইতেছে সেই সকল জিনিষ যাহার জন্য আমাদের টাকাকড়ির প্রয়োজন হয়। টাকাকড়ি হইতেছে অর্থের মাপকাঠি। সোণারূপা, টাকাকড়ির কোনই মূল্য থাকিত না যদি আমরা তাহার দ্বারা আমাদের বাঁচিবার ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নানা উপকরণ কিনিতে না পারিতাম। মানুষের খাওয়া পরার উপকরণ, বাসের ঘরবাড়ী, চলাফেরার যানবাহন প্রভৃতি জীবনধারণের আবশ্যক জিনিষগুলিই হইতেছে আসল সম্পদ বা অর্থ। মানুষের তখনই অর্থকষ্ট বা অর্থ-সমস্যা উপস্থিত হয় যখন সে জীবনধারণের এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণগুলি জুটাইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, হয় সকলের জীবনধারণের মত যথেষ্ট উপকরণ বা অর্থ উৎপন্ন হইতেছে না, নয়তো যথেষ্ট উৎপাদন সত্ত্বেও সমাজ এবং রাষ্ট্রের অব্যবস্থার ফলে ভাগ ঠিকমত না হওয়ায় লোকে কষ্ট পাইতেছে। আমাদের দেশে এই দুই দোষই দারুণ অর্থসমস্যার জন্য দায়ী—উৎপন্নও যথেষ্ট হইতেছে না, এবং বিভাগও অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখন অবস্থা বুঝিয়া এমন ভাবে আমাদের গড়িয়া উঠিতে হইবে যাহাতে দেশের সকল ক্ষেত্র হইতেই উপযুক্ত সম্পদ উৎপন্ন হয় এবং সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার গুণে সেই অর্থ ঠিকমত বিভক্ত হইয়া দেশের সকল স্তরের লোককেই সমৃদ্ধ ও সুখী করিয়া তুলে। সকলেই যাহাতে

সামর্থ্যমত জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিকে খাটাইয়া যথেষ্ট অর্থ উৎপাদনের ক্ষেত্র পায় এবং বিভাগের যোগ্য ব্যবস্থা থাকায় অর্থ উৎপাদনে সম্যক-ভাবে উদ্বুদ্ধ হয় তাহাই করা দরকার। জগতের লোক এতদিন অব্যবস্থার এবং অবসাদের জন্য কষ্ট পাইতেছে বলিয়া চিরদিনই কি পাইতে হইবে? সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধি ও জীবনের আনন্দে পরিপূর্ণ একটি আদর্শ মানব সমাজ কি চিরদিনই কবি দার্শনিকের স্বপ্নই থাকিবে? যখন বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলে স্বল্প সময়ে ও অপেক্ষাকৃত বহু গুণ কম পরিশ্রমে বহু অর্থ উৎপাদনের নানা ক্ষেত্র বাহির হইয়াছে ও হইতেছে তখন আজ আর ইহা একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ইহাতে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ এবং জীবন-সমস্যা জড়িত, এ জন্য প্রত্যেকেরই এই বিষয় ভাল করিয়া ভাবা এবং বুঝা দরকার।

গ্রাম আমাদের দেশের পনর আনা যায়গা এবং দেশের বেশীর ভাগ সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে গ্রাম হইতেই। সুতরাং গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে নূতন সমৃদ্ধি সৃষ্টির ক্ষেত্র। পৃথিবীর লোক সংখ্যাও যেমন বাড়িয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও প্রতিভার বলে সম্পদ-বৃদ্ধির উপায়ও তেমনি বাড়িয়াছে। সেইগুলির উপর নজর রাখিয়া ক্রমশঃ আমাদের সেইগুলিকে যাহাতে গ্রামের সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগাইতে পারি তাহা দেখিতে হইবে। ইহা কখন গ্রামের একজন দুইজন গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়; এ জন্য গ্রামে গ্রামে গড়িতে হইবে সমবায় সমিতি। যেমন,—জলসেচনের জন্য একটি কি দুইটি অয়েল এঞ্জিনযুক্ত পাম্প থাকিলে গ্রামে ফসলের উৎপাদন বেশী করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা একজন দুইজন গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয় এবং একটী পাম্পের উপযুক্ত ক্ষেত্রের তুলনায় তাহার জমী খুব কম; কিন্তু সমবায়ের দ্বারা গ্রামবাসী একত্র হইয়া একটী পাম্প আনাইয়া ব্যবস্থামত সকলেরই সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর একজন কি দুইজন বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে অর্থ ও বুদ্ধি খাটাইয়া সমৃদ্ধ হইলে গ্রামের দুঃখ দূর হইবে না—সকলেই পরস্পরের সহায়তায়

সমৃদ্ধ হইয়া যাহাতে গ্রামের ও দেশের স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে।

শুধু এই জন্যই নয়, যেদিক হইতেই দেখি না কেন আজ আর প্রত্যেকের নিজ নিজ গতানুগতিক প্রচেষ্টায় এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সহিত কাড়াকাড়ি প্রতিযোগিতায়—অর্থ-সমস্যার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার দিন নাই। তাহাতে উৎপাদন তো কম হয়ই, তাহা ছাড়া পাট ধান প্রভৃতি ফসল বিক্রীর সময় তাহা ছোট ছোট দালাল মহাজন আড়তদার প্রভৃতির হাত ফের হইয়া যায় বলিয়া উপযুক্ত দাম কৃষকের ভাগ্যে জুটে না। কোনরূপ সমিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় যথেচ্ছভাবে এক এক রকমের ফসলের আবাদ হওয়ায় কোন কোন ফসলের জগতের প্রয়োজনের বা চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন করায় মূল্য খুব কম হয়; এমন কি চাষের খরচাও পোষায় না। আজকাল রেল জাহাজ প্রভৃতির কল্যাণে জগৎ ক্রমশঃ একসূত্রে গাঁথা হইয়া উঠিয়াছে; এক জায়গার উৎপন্ন জিনিষ পৃথিবীর বহু দূর দেশে চালান হইতেছে। কোথাও যদি খুব কম খরচে অনেক গম উৎপন্ন হইতে পারে তবে অন্য দেশে সেই গম চালান হইয়া খুব কম দামে বিক্রী হইয়া সেই দেশের গমকে হঠাইয়া দিবে। এ জন্য শুধু যেমন তেমন ভাবে উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিলেই চলে না—এ সব ব্যবস্থা সমস্ত দেশকে সমবায় সমিতিতে গড়িয়া তুলিয়া সমস্ত জগতের চাহিদার ও উৎপন্নের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটি কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

যে যার মত চলিলে এবং 'কে কার কড়ি ধারে' বুলি ধরিলে বিবাদ বিসম্বাদ বাড়িয়া চলে, সমবেত ভাবে সম্পদ সৃষ্টি হয় না, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় না। ইহাতে উকীল মোক্তার মুহুরী পাটোয়ার ডাক্তার প্রভৃতির কাজ বাড়ান হয় মাত্র। উকীল মোক্তার ডাক্তার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট জজ প্রভৃতিকে যে কাজ করিতে হয় তাহা সম্পদ সৃষ্টির কাজ (positive or creative work) নয়। তাহা হইতেছে

সৃষ্টির গতি পথের ভুলসংশোধনের কাজ (negative or unproductive work)। মিলে মিশে সুনিয়মে এখনও একত্র হইয়া কাজ করিয়া মানুষ সৃষ্টির অন্তরের প্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিতে শিখে নাই বলিয়াই তাহার সেই ভুল সংশোধনের জন্য এতগুলি মেধাবী ব্যক্তিকে সৃষ্টি এবং উৎপাদনের কাজ ফেলিয়া আইনের ও শৃঙ্খলার জোড়াতালি দিয়া বেড়াইতে হইতেছে। ইহাকে দেশের অর্থনীতির অপচয় ছাড়া আর কি বলিব? যতখানি অর্থ ও সম্পদ দেশকে এই আইনজীবী এবং জজ ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ প্রভৃতিকে দিতে হইতেছে তাহা হইতেছে অর্থনীতির দিক হইতে দেশের সেই পরিমাণ সাজা (penalty) এবং নীতির দিক হইতে অবনতি। ডাক্তারেরও কাজ non-creative বা সংশোধন কাজ। মানুষ স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি বুঝিয়া চলিতে শিখে নাই বা পারে না বলিয়া কত উচ্চ প্রতিভাকে অন্য সম্পদ সৃষ্টির কাজ ফেলিয়া এই জোড়াতালির কাজে (non-creative work) জীবন কাটাইতে হইতেছে। এখনও মানব সমাজের বিবাদ বিসম্বাদ মুক্ত হইতে দেরী আছে এবং রোগ জরা মৃত্যুকে জয় করিতেও অনেক বিলম্ব ঘটিবে। কিন্তু এই সব এখন হইতেই যথাসম্ভব কম করিতে পারিলে অর্থনীতির দিক হইতে অপচয়ও অনেক কমিবে। ইহা শুধু সম্ভব যদি নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া গ্রামবাসী ভিতর হইতে একতাবদ্ধ হইয়া আন্তরিকভাবে প্রতীকারের জন্য সমবায় সমিতির ভিতর দিয়া নিজেদের গড়িয়া তুলেন।

নিজের মত চলিয়া গ্রামে কখনও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হয় না। কারণ এমন অনেক কাজ আছে তাহা শুধু সমবায় সমিতির হাতেই সম্ভব। জরা-জীর্ণ মজিয়া যাওয়া যে পুকুরটী গ্রামের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতেছে তাহা কেন সংস্কার হয় না খোঁজ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সেই পুকুরটী এক সময় একজন মালেকের হাতে ছিল, তিনি মন দিয়া মাছ ছাড়িতেন এবং পরিষ্কার রাখিতেন। ক্রমে এখন তাহার অনেকগুলি সরিক হইয়াছে। পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া কেহ আর পুকুর পরিষ্কার করেন

না, মাছও ছাড়েন না। যাহা ছিল সম্পদ, স্বাস্থ্য সৃষ্টির উৎস তাহা আজ হইয়াছে অনর্থের মূল।

মৎস্য সম্পদ তো সৃষ্টি হয় না, মাঝে মাঝে বরং সামান্য মাছের জন্য মাথা ফাটাফাটি ও উকীল মোক্তার পুলিশের হাতে হয় সম্পদের হানি। এইরকম ভাল ভাল বাগানের জঙ্গলে পরিণত হওয়ারও মূলে রহিয়াছে মানুষের আত্মসর্ব্বস্ব হইবার কদর্য্য ইতিহাস। কিন্তু ক্ষতি হইতেছে সমস্ত গ্রামের। মজা পুকুর এবং জঙ্গল সমস্ত গ্রামের স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মশক্তি অপহরণ করিতেছে। যেমন তেমন ভাবে যেখানে সেখানে গাছ ও বাঁশঝাড় লাগাইয়া, ডোবা সৃষ্টি করিয়া, একে অপরের যে অস্বাস্থ্যকর আওতা ও অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে তাহা সমগ্র গ্রামের সমস্যা: নিজে নিজে প্রতীকার করিতে হইলে শুধু ঝগড়া ও লাঠালাঠি হইবে। একমাত্র সমবায় সমিতির ভিতর দিয়া সকলে একতাবদ্ধ হইয়া সমস্ত গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা দ্বারাই ইহার প্রতীকার সম্ভব। পাশাপাশি দুই তিনটী গ্রামের সমবায় সমিতি একত্র হইয়া ভাল একটি ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিংবা গ্রামের সমর্থ যুবকগণ নিজেদের কায়িক পরিশ্রমে একটি হাসপাতালের মত ব্যয়সাধ্য ঘরবাড়ীও গড়িয়া তুলিতে পারেন। কঠিন রোগীকে সেই স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে রাখিয়া সেবাযত্ন এবং উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থাও হইতে পারে। 'দশের লাঠি, একের বোঝা'— অনেক কঠিন ব্যয়সাধ্য কাজও সমবায় নীতিতে সুসাধ্য হইতে পারে। গ্রামের আনন্দের জন্য একটি লাইব্রেরী ঘর, কি একটি ক্লাব, বা সান্ধ্য-সমিতির ঘর, একতাবদ্ধ গ্রামের কাছে বেশী কিছু কথা নয়। এই সকলের জন্য তখন আর চাঁদার খাতা বগলে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হইবে না। গ্রামবাসী যুবকগণ তাঁহাদেরই সমবায় সমিতির নির্দ্দেশমত নিজেদেরই শ্রমের গুণে ইহা গড়িয়া তুলিতে পারিবেন। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করিয়া যে সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিবে তাহা গড়িয়া তুলিবে নূতন সম্পদ, নূতন স্বাস্থ্য, নূতন রাষ্ট্র, নূতন সমাজ।

অনেকগুলি গ্রামের পার্শ্বে বা মাঝে হয়তো একটি বিল বা প্রকাণ্ড জলা আছে। অথচ তাহার এক মাইল কি দুই মাইল দূরে একটি নদী বহিয়া চলিয়াছে। একটি খাল কাটিয়া এই নদীর সঙ্গে বিলের সংযোগ ঘটাইতে পারিলে বহু গ্রামের স্বাস্থ্য, কৃষি ও মৎস্য-সম্পদ বৃদ্ধির সুন্দর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় হয়তো গ্রামবাসী ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড বা জেলাবোর্ডকে লিখিয়া হয়রাণ হইতেছেন—জেলাবোড নাকে কাটি দিয়াও হাঁচিতেছে না. (আর জেলাবোর্ডই বা কি করিবে? তাহার ব্যয়বহুল ইঞ্জিনিয়র, ডাক্তার, রাহা খরচ বা travelling allowance প্রভৃতি ঠাট বজায় রাখিয়া যে অর্থ থাকে তাহাতে কতগুলি জায়গার অভিযোগ মিটাইবে?)। এই সব ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির দ্বারা অদ্ভুত কাজ হইতে পারে। যে বিশ পচিশখানা গ্রামের স্বার্থ এই খালে জড়িত, সেই সকল গ্রামের সমর্থ যুবকগণ যদি সমবায় সমিতির কর্ত্তাদের নির্দ্দেশমত কাজে লাগেন তবে এক এক জনের ভাগে যেটুক মাটী কাটিবার ভার পড়িবে তাহা তিনি অনায়াসেই করিতে পারিবেন। ইংরাজীতে একটি কথা আছে 'God helps those who help themselves' সৎকাজে অগ্রণী হইলে ভগবানের সহায়তা লাভ হয়, ইহা খুব সত্য। নিজেরা আন্তরিক চেষ্টায় অগ্রণী হইলে তখন জেলাবোর্ডেরও সাহায্য সহজে মিলে।

নানা প্রকার কল্যাণের ক্ষেত্রে সকলে সমবেত ভাবে সকলের জন্য কাজ করিলে মনে এক নূতন বল ও আনন্দ পাওয়া যায়। তখন আর নিজেকে ক্ষুদ্র অবসাদগ্রস্ত ও দুর্ব্বল মনে হয় না,—মনে হয় যেন সকল গ্রামের লোক আমরা এক পরিবারভুক্ত;—একসঙ্গে সকলের দুর্দ্দশা দূর করিতে কি উৎসাহ আনন্দ আসে! আবার সমিতির ঘরে বসিয়া প্রধানদের গ্রামের নানা বিষয়, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে মীমাংসা করিতে কি উৎসাহ! যেখানে চক্ষু কোটরগত ও নিষ্প্রভ ছিল, নিজ নিজ দুর্দ্দশার চিন্তায় বুদ্ধি যেখানে এতদিন মলিন ও শঙ্কায়

কুণ্ঠিত ছিল, আজ সমগ্র গ্রামের ও দেশের ব্যবস্থা করিতে নূতন নূতন ক্ষেত্র পাইয়া সকলে কী উৎসাহেই না আলোচনা করিতেছে। কেউ বলিতেছে অমুক নূতন ফসল গ্রামের অমুক মাঠে আনিয়া নূতন আবাদ করিতে পারিলে খুব লাভ হইবে—তাই লইয়া সকলে কেমন উৎসাহ ভরে আলোচনা করিয়া স্থির করিতেছে। কেউ বা গ্রামের নূতন আনা পাম্পে কেমন কাজ হইতেছে বর্ণনা করিতেছে—কেউ বলিতেছে তাঁহাদের মাঠে পাম্পটী সপ্তাহে আরো একদিন খাটাইতে পারিলে ভাল হয়। এবার পাট সমিতির গুদামে আরো কিছু দিন ধরিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এই সব নানা আলোচনায় সমিতির সান্ধ্য আসর বা বৃষ্টির দিন কেমন সরগরম হইবে।

বাহির হইতে চাপান কোন একতা (যেমন ইউনিয়ন বোর্ড) বা কোন বিশেষ প্রয়োজনের দায় মিটাইবার জন্য একতা (যেমন মহাজনের হাত হইতে রক্ষার জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটী) দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। গ্রামের লোকে সকলে যখন অন্তরের সঙ্গে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এইরূপ ভাবে একতাবদ্ধ হইয়া সমবায় সমিতি গড়িতে বদ্ধপরিকর হন তখনই ইহা সম্ভব। বাহির হইতে বাধ্য করিয়া চাপাইয়া দেওয়া কিছু, আন্তরিক সেই উদ্যম ও উৎসাহ আনে না যাহা সফলতার জন্য একান্ত দরকার।

বাহির হইতে দেওয়া প্ল্যান অনেক ভাল বা নির্ভুল হইলেও গ্রামবাসীকে কখন সমর্থ ও যোগ্য করিয়া তুলিবে না। নিজেদের মত করিয়া নিজেরা বার বার সকলে উদ্যম ও বুদ্ধি খাটাইয়া যাহা গড়িবেন তাহাতে অনেক সময় ভুল হইলেও তাহাতে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি খুলিবে, ক্রমে সার্থকতা, সাহস ও সামর্থ্য বাড়িবে। আমাদের ভিতর এখনও সেই প্রাচীন সুন্দর গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার সংস্কার রহিয়া গিয়াছে যাহাতে অন্য দেশের অপেক্ষা এ দেশে এরূপ ভাবে গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া এইরূপ ধরণের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সহজে সম্ভবপর হইবে।

মুসলমান যুগেও গ্রামের এমন অবনতি হয় নাই। সামান্য জনকতক আমীর ওমরাহ ও বড় রাজকর্ম্মচারী ছাড়া বেশীর ভাগ সম্পন্ন ব্যক্তি গ্রামে বাস করিতেন। শৌর্য্য ও সম্পদে পূর্ণ বাংলার গ্রাম এখনকার মত এমন অসহায় হইয়া পড়ে নাই। নিজ নিজ ব্যবসায়ে বাংলার কৃষক তাঁতি কামার কুম্ভকার পাইক পদাতিক এক রকম সুখী ছিল। শাস্ত্র ও শস্ত্র চর্চ্চার জন্য অনেক যায়গায় উপযুক্ত নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। তারপর ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের দেশেরও দোষ আসিল। গ্রামকে উপেক্ষা করিয়া সহরের শ্রীবৃদ্ধি করা ইংরাজ রাজত্বেরই বিশেষত্ব। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফলে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল যে, অনুৎপাদনকারী এক দল লোকের (unproductive class) আয় উৎপাদনকারীদের চেয়ে অনেক বেশী হইবার সুবিধা ঘটিল। যেমন রাজকর্ম্মচারীদের (Govt. servants) বেতন পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী করিয়া দেওয়া গেল, ওকালতি, মোক্তারীতে খুব বেশী পয়সা পাওয়ার সুযোগ ঘটিল, ডাক্তারীতেও তথৈবচ। ফলে গ্রামের লোক,—যাঁহাদের একটু অবস্থা ভাল ও উদ্যমশীল,—সহরে আসিয়া নিজ নিজ উৎপাদনকারী (productive work) কাজ ছাড়িয়া লেখাপড়া শিখিয়া এই সব বেশী অর্থকরী কাজে লাগার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। গ্রাম এবং গ্রামের অর্থ উৎপাদনের ক্ষেত্র ক্রমশঃ কাণা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অথচ লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহারা যে কাজ করিতে লাগিলেন তাহা দেশের কোন সম্পদ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করিল না। আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার তাঁবেদারীতে বেশী আয়ের সুবিধা থাকায় চারিদিকের গ্রাম হইতে হুড় হুড় করিয়া সব ভাল লোক আসিয়া জুটিয়া যাওয়ায় নূতন সহরের পত্তন হইতে লাগিল। কিন্তু এই তাঁবেদারদের সংখ্যা দেশের অনুপাতে সীমাবদ্ধ থাকায় মাত্র সামান্য কয়েকজনের কিছু আয় হইল। বাকী সকলের ভাগ্যে জুটিল ক্রমশঃ ভীষণ প্রতিযোগিতা। এ দারুণ প্রতিযোগিতার মুখে পড়িয়া কিছুকাল পরেই সহরের বাবুদের দুর্দ্দশা ও অর্থসমস্যায় পড়িতে হইল। সহরের

কেরাণী এবং অনেক উকিল মোক্তার ডাক্তারগণের এই দারুণ প্রতিযোগিতার মুখে কি ভাবে দিন যাইতেছে তাহা তাঁহারাই জানেন। আর তাঁহাদের ছেলেদের?—লেখাপড়া শিখিয়াও কোনদিকে পথ নাই—হতাশার জীবন্ত মূর্ত্তি। চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই দেশের কৃষকের ছেলেকেও এই ভীষণ সমস্যায় পড়িতে হয় না—নিজের পরিশ্রম ও বুদ্ধি খাটাইবার অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রও তাহার আছে। কতজন কোন চাকরী পাইতেছে না। ছেলেরা ভাল দুধ পাইতেছে না। কলিকাতার মত বড় সহরে আলো বাতাসও (যাহার দাম লাগে না) মিলে না। সেই সব হতাশার মূর্ত্তি ও বেদনা-ক্লিষ্ট ছবি দেখিয়াও যদি আমরা না ফিরি—তবে আর কোন আশা নাই।

এদিকে এই আর একদিকে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সহরে নানা বিলাস উপকরণের সুবিধা হওয়ায় বাংলার বেশীর ভাগ জমিদারই গ্রাম ছাড়িয়া সহর আশ্রয় করিলেন—প্রজার কষ্টার্জ্জিত অর্থ বিদেশে ও বিলাসে অজস্র ব্যয় করিতে লাগিলেন। সহরে অনেকের ইহাতে মোসাহেবী প্রভৃতিতে টাকা উপায় হইতে লাগিল বটে কিন্তু গ্রামের অর্থ বেশীর ভাগ আবার গ্রামে গিয়া সম্পদ ও স্বাস্থ্য আনিল না। পুকুরগুলি মজিল, তাঁহাদের বাসভবনগুলি ভগ্নদশা ও জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গ্রামের অনিষ্টই করিতে লাগিল। কি করিয়া গ্রামের অর্থনৈতিক ও অন্য সকল বিষয়ে অবনতি ঘটিল আজ আবার, এই নূতন করিয়া গড়িবার যুগে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে।

এই দারুণ অর্থসমস্যার ও প্রতিযোগিতার মুখে পড়িয়া সহরের বাবুদেরও আজ গ্রামে ফিরিবার কথা মনে হইতেছে বটে কিন্তু সেখানে কোন আয়ের পথ না থাকায় এবং উপেক্ষায় গ্রাম একেবারে অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ায় তাঁহারা ফিরিতেও পারিতেছেন না। এদিক থেকে দেখিলেও গ্রামই হইতেছে দেশের এই সমস্যা সমাধানের প্রধান ও প্রথম ক্ষেত্র। গ্রামের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, স্বাস্থকর ব্যবস্থা করিতে হইবে, সামাজিক নানা

নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ ও সুশিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিবাদ-বিসম্বাদ যাহাতে গ্রামের সালিশ ব্যবস্থায় মিটিয়া যায় তাহা করিতে হইবে, গ্রামবাসীকে আদালতের হয়রাণী ও অর্থব্যয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অর্থ-সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামে গ্রামে যে সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইবে এই সমস্ত বিষয়। গ্রামের সকল লোক মিলিয়া নিজেদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান বা মাতব্বর বাছিয়া দিবেন; তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় মিলিয়া এই সব বিষয় আলোচনা করিবেন, জরুরী বিষয় থাকিলে গ্রামের সকল লোককে লইয়াও আলোচনা করিতে পারেন। এইরূপ পাশাপাশি পাঁচখানি কি সাতখানি গ্রাম লইয়া একটি কেন্দ্র সমিতি থাকিবে, তাহাতে প্রত্যেক গ্রামের দুইজন প্রধান মাতব্বর মাসে একদিন এক একটি গ্রামে মিলিত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিবেন। এইরূপ ভাবে সকল দেশ ভরিয়া সমিতি ও কেন্দ্র সমিতি গড়িয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা হইলে একটি প্রধান কেন্দ্র সমিতি প্রত্যেক জেলায় হইতে পারে; তাহার এমনই শক্তি হইবে যে দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, জেলাবোর্ড, কাউন্সিল, এসেম্ব্লি প্রভৃতি তাহারই ভিতর দিয়া গ্রামবাসী এবং সমগ্র দেশের স্বার্থের অনুকূলভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাইতে পারিবে। বাহিরের লোকের খেয়াল ও সুবিধামত তখন আর গ্রামকে চলিতে হইবে না, গ্রামের নির্দ্দেশমত তখন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলিবে। তাহাতে গ্রাম তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা পাইবে। সমগ্র দেশের কল্যাণ আর মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সুবিধার জন্য বলি দেওয়া চলিবে না। গ্রামবাসী সকলকেই চলিতে শিখিতে হইবে তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রধানদের নির্দ্দেশমত। ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে যে সমগ্রের কল্যাণেই ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজ নিজ গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থ দেখিতে গিয়া প্রকৃত লাভ কিছু হয় না—প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে যেমন নিজেরও বিপদ, সেই রকম একের অমঙ্গল, রোগ, দারিদ্র্য অন্যকেও অলক্ষ্যে ভুগাইতে থাকে; স্থূল দৃষ্টিতে অনেক সময় ইহা বুঝা যায় না, কিন্তু একটু ভাবিলেই তাহা ধরা পড়ে।

সমিতির নিজস্ব কো-অপারেটিভ বা সমবায় ব্যাঙ্ক থাকিবে, তাহা হইতে লেন দেন এবং কেনা বেচার কাজ হইবে, ব্যাঙ্কের সংলগ্ন কো-অপারেটিভ ষ্টোর এবং ধানের গোলা, পাটের গুদাম থাকিবে। প্রথমে কিছু ভুলচুক হইতে পারে কিন্তু ক্রমশঃ এই সব কাজে গ্রামবাসী সুদক্ষ হইয়া উঠিবেন। গ্রামবাসী যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিবেন। নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র যতদূর সম্ভব নিজেদের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মধ্য হইতেই মিটাইবার চেষ্টা করিবেন। একজনের কিছু পয়সা হইলেই তাহা তাঁহার খুসীমত বিদেশী বিলাসের উপকরণে ব্যয় করা চলিবে না। সমস্ত বিষয়েই সমিতির প্রধানদের, যাঁহারা সমস্ত গ্রামের সমবেত কল্যাণ চিন্তা করিবেন, তাঁহাদের নির্দ্দেশমত চলিতে হইবে। যখন সমিতির হাতে কিছু বেশী পয়সা হইবে বা কোন বৎসর সমিতির কো-অপারেটিভ ষ্টোর পাট ও ধানের ব্যবসায়ে বেশী অর্থ সমাগম ও লাভ হইবে, তখন গ্রামের মঙ্গলকর কোন ছোট কারখানা করিয়া, কি ভাল জলের পাম্প বা দমকল আনিয়া, সেই অর্থ দ্বারা দেশের মঙ্গলকর নূতন অর্থ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। এন্টি-ম্যালেরিয়া ও স্বাস্থ্য সমিতিও এই প্রধানদের নির্দ্দেশমত সুন্দরভাবে কাজ করিতে পারিবেন। রাস্তা ঘাট কূপ পুষ্করিণী সমস্তেরই ব্যবস্থা হইবে ; যে টাকা জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড দিবেন তাহার সহিত সমিতি গ্রামবাসী যুবকগণের শ্রম ও উৎসাহ যোগ দিয়া সমস্তই সুসাধ্য করিয়া তুলিবেন। সমিতির একটী ছোট পাঠাগার (Library) এবং তাহার চারিদিকে একটি ফুলের বাগান থাকিবে, সেখানে গ্রামবাসী মিলিয়া পড়াশুনা ও উদ্যান রচনা করিবেন। পাঠাগারে কৃষি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ভাল ভাল বই থাকিবে এবং নানা মাসিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রভৃতি থাকিবে। সকলে আলোচনা করিয়া পরস্পর জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং উৎসাহ হইবে। কয়েকটি গ্রামের সমিতি এক সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মাঝে মাঝে সকলে কিছু খরচ করিয়া সময় সময় ভাল বক্তা ও জ্ঞানী লোক বা

কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন লোককে গ্রামে আনিয়া সকলে তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতা শুনিতে পারেন। ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতাও বৎসরে চার পাঁচ বার করিয়া হওয়া বেশী কিছু কথা নয়। এমন ভাবে একতাবদ্ধ হইয়া গ্রাম যখন নানা কল্যাণের ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে থাকিবে তখন গ্রামের লোক আর সহরে যাইয়া বাস করিবার কথা কল্পনাও করিবে না, বরং সহরের আবর্জ্জনা ও অর্থ প্রতিযোগিতায় ক্লিষ্ট অনেকেই গ্রামে ফিরিতে থাকিবে। পাশা উল্টাইবে—গ্রামই তখন হইবে শ্রী, স্বাস্থ্য ও আনন্দের ক্ষেত্র।

যদি এমনই হয়, জমীদার কি মহাজন কি অত্যন্ত স্বার্থপ্রিয় দুই একজন লোক সমিতির সঙ্গে যোগ দিয়া সমগ্রের কল্যাণ দেখিতে না চান, কিংবা দুই তিনটী দলাদলি এত প্রবল হয় যে সকলের একতা অসম্ভব হয়, তবুও যাঁহারা মনে প্রাণে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝিবেন, তাঁহাদিগকেই মিলিয়া সমিতি স্থাপন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। দুই একজনের প্রতিকূলতা বা দলাদলির বাধায় এই মহান কাজ ফেলিয়া রাখা চলে না। কঠিন বাধা থাকিলেও তাহা জয় করিতে হইবে। মানুষের যে বুদ্ধি, যে প্রতিভা জগতকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য সৃষ্ট, সকল প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করিয়া স্বাস্থ্য, সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া মানব সমাজকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার জন্য যাহার প্রেরণা, তাহা শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতির দোষে শুধু হীন স্বার্থ চেষ্টায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যয়িত হইতেছে। শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া প্রত্যেকে চাহিতেছে ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং বেশী হইলে নিজ জাতিগত প্রতিষ্ঠা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণেই যে ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ নিহিত তাহা খুব অল্প সংখ্যক লোকেই ঠিক ভাবে বুঝিয়াছেন। ইহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যতদিন মানব মনের এই দৃষ্টির (angle of vision) পরিবর্ত্তন না হইতেছে ততদিন আমাদিগকে এই মহান্ আদর্শ প্রচার করিয়া যাইতে হইবে এবং বাধার

বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি গড়িতে হইবে। দরকার হইলে অসুরকে তাহার নিজের ক্ষেত্রেই জয় করিতে হইবে।

এই শক্তি সংগ্রহের প্রথম কথা সঙ্ঘবদ্ধতা (organisation)। আজ শক্তির যত কেন্দ্র এই তথ্য অবগত হইয়া সকলেই organised বা সঙ্ঘবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্ট বলুন, মুসোলিনীর ফ্যাসিসিষ্ট বলুন, বলশেভিকী বলুন, সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তির ব্যূহ রচনা করিয়া অজেয় হইতে চাহিতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে শক্তি সাধনার ফল এই অবস্থার প্রতীকার করিতে অপারগ। সেই জন্য বাংলার একান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত গ্রামবাসীর আজ শক্তিলাভ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এইরূপ সমিতি স্থাপন করা দরকার।

অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব আমাদিগকে এমন অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে যে, আমরা আর ভাবিতে পারি না যে এই দুনিয়ায় যে পরিশ্রম করিবে তাহারই অধিকার আছে সুখ, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইবার। সকলকেই শুনাইতে হইবে যে সুখ, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যে সকলেরই অধিকার। একদিকে যেমন সকলকে জীবন পূর্ণভাবে ভোগ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, অপরদিকে যাহাতে সকলে পটু হইয়া সম্পদ বাড়াইয়া তুলিতে সচেষ্ট হয় তাহাও দেখিতে হইবে।

আজ আমরা কয়েকটি সাধারণ ব্যাপার হইতে দেখাইব আমাদের উপযুক্ত দৃষ্টির ও চেষ্টার অভাবে কেমন করিয়া সামান্য ব্যাপার হইতে কত সম্পদের অপচয় ঘটে। বাংলা দেশে দুই এক বৎসর অন্তরই কোন কোন বৎসর অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন ঠিক ধান ফলিবার (ফুল বা শীষ বাহির হইবার) মুখে দুই এক পশলা বৃষ্টির অভাবে কি দারুণ ক্ষতি হয়। বুনিবার পর সমানে বৃষ্টির যোগান পাইয়া পরিপুষ্ট ধানের গাছের উজ্জ্বল শ্যামশ্রী দেখিয়া কৃষকের মন আনন্দ-পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে,

এমন সময় যখন ধান থোড়মুখ বা ফুলিবে তখন দিন পনর খরা বা অনাবৃষ্টি পড়িল, আর কৃষকের মুখ শুকাইয়া গেল। পশ্চিমবঙ্গে স্থানে স্থানে যেখানে উপযুক্ত জলসেচনের ব্যবস্থা আছে সেখানে এই দুর্গতি কতকটা এড়াইতে পারা যায়। কিন্তু পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে, যেখানে বৃষ্টির জল আর নদীর বান ভরসা, এই দুর্গতি কি ভীষণ হয়! বহু কোটী টাকার ধানের ফলন সাময়িক কিছু জলের অভাবে নষ্ট হয়; আর এত দনের পরিশ্রম ও যত্নের এই পরিণতি ঘটায় কৃষকের মনে কি দারুণ অবসাদই না আসে!

বৎসরের পর বৎসর এই যে দুর্গতি ইহার প্রতীকার কি সম্ভব নয়? আমাদের মনে হয় প্রত্যেক গ্রামের চারিদিকের মাঠে চারিটি (কি গ্রামের আয়তন বুঝিয়া আরো বেশী) সেচের জন্য বড় পুষ্করিণী থাকিলে কিংবা অভাবপক্ষে বড় বড় কতকগুলি কূপ মাঝে মাঝে থাকিলেও অনেক ফল হয়। আর যদি অল্প দামে এবং সহজে নড়ান চড়ান যায় (portable) এইরূপ জলছেচা কল প্রত্যেক গ্রামে একটী কি দুইটী থাকে তাহা হইলে কাজের খুব সুবিধা হয়। শুধু মাঝে মাঝে সাময়িক বৃষ্টির অভাবের দারুণ ক্ষতি নিবারণের জন্য এই সকল পুকুর বা কূপ হইতে সেচ দিবার আবশ্যক হইবে এবং বর্ষাকালে আশা করা যায়, এই সব জলাশয়ে জলাভাব ঘটিবে না। সমবায় নীতিতে এবং গ্রামের লোক সকলে পরামর্শ করিয়া ইহা করিতে পারেন।

বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র বলিয়া গ্রামের মধ্যে বেশী পুকুর না করিয়া গ্রাম হইতে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে এইরূপ ধরণের পুকুর থাকা স্বাস্থ্যের দিক হইতেও ভাল। এই সকল পুকুরের ধারে নারিকেল তাল খেজুর সুপারি এবং দু'চারটি ভাল আম কাঁঠালের গাছও লাগান চলে। পুকুরের মাছও গ্রামের অভাব অনেক দূর করিবে। এই সব জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া সাধারণের সমবায় হইতে করিতে পারিলে সকলের সমান স্বার্থ থাকায় চুরি কম হইবে এবং ভাল করিয়া বুঝিয়া করিতে পারিলে ইহাতে গ্রামের অনেক আর্থিক চাপ দূর হইবে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে চারিদিক শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কৃষককে মহিষ গরু স্নান করাইতে ও জল খাওয়াইতে কতদূর মাঠ পাড়ি দিয়া দূর বিলে বা একপ্রান্ত হইতে গ্রামের অপর প্রান্তের পুকুরে গরমে কি কষ্ট করিয়া যাইতে হয় এবং কত সময় তাহাতে বৃথা নষ্ট হয়। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহারও প্রতীকার হইতে পারে। গ্রামের মধ্যে শুধু একটি বেশ ভাল পুকুর রাখিতে হয় তাহাতে গ্রামবাসীর স্নান এবং পানীয় জলের অভাব মিটিবে এবং ইহার চারিধার এবং পাড় গাছপালা বিবর্জ্জিত করিয়া জলটীও বেশ পরিষ্কার রাখিতে হয়। বাকী গ্রামের চারিদিকে গ্রাম হইতে দূরে মাঠের মধ্যে চাষের এবং গরু-বাছুরের সুবিধার জন্য এইরূপ চারিটী জলের যায়গা দরকার। ইহাতে অর্থনৈতিক সুবিধা এবং স্বাস্থ্যের সুবিধা দুইই হইবে।

সহরে অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন পাথুরে কয়লার আগুনে রান্না হয়। ঐ সকল কয়লার ছাই একরূপ ফেলা যায়, কারণ ইহার ধক্ বা তেজ বেশী বলিয়া চাষের কাজে বড় একটা লাগে না এবং বাগানের তরিতরকারীর গাছও ইহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বলিয়া যায়। কিন্তু লেখক ইহার একটী ব্যবহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। লেখক একবার তাঁহার কুষ্টিয়ার বাটীতে বাগানে যেখানে এই পাথুরে কয়লার ছাই গাদা করা ছিল সেখানে—একরূপ সেই গাদার মধ্যেই—দুইটী মর্ত্তমান কলার চারা বা তেউড় পুতিয়াছিলেন। পাঁচ-ছয় মাস মধ্যেই সেই গাছ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল এবং অচিরে নূতন পোয়া ছাড়িয়া সমৃদ্ধ ঝাড়ে পরিণত হইল। সেই গাছে কলা যাহা ফলিয়াছিল তাহা দেখাইবার মতই বলি। কলাগাছের গোড়ায় ছোট ছোট কেঁচোর মত একরূপ পোকা লাগিয়া কলাগাছকে কাবু করিয়া দেয় এবং কলার আকারও ইহাতে ছোট ও দাগযুক্ত হয়। কলাগাছের গোড়ায় ছাই দিলে এই দোষ নষ্ট হয়। ছোট পোকা গোড়ায় আর লাগিতে পায় না এবং গাছ যেমন সুশ্রী সবল হয় ফলও সেইরূপ নিটোল হয়।

মফঃস্বল সহরে অর্থাৎ কলিকাতা ছাড়া সহরে যাঁহাদের বাড়ীর সংলগ্ন কিছু যায়গা আছে বাগানের প্রান্তে দুই চার ঝাড় মর্ত্তমান এবং কাঁচকলার গাছ লাগাইয়া, বর্ষার পূর্ব্বে তাহার গোড়া কোপাইয়া প্রত্যেক ঝাড়ের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে এই পাথুরে কয়লার ছাই ও কিছু মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে পারেন। মানকচু গাছও পাথুরে কয়লার ছাই হজম করিয়া সমৃদ্ধ হয় এবং ছাইয়ের সংসর্গে তাহার চুলকানিও অনেকটা ভাঙ্গিয়া মুখ কম ধরে। ছাই হইতে এইরূপে সম্পদের সৃষ্টি করা যায়। শুধু ছাই নয়, যে সকল আবর্জ্জনা আমরা বাড়ীর কাছে ফেলিয়া বা জমা করিয়া অস্বাস্থ্য সৃষ্টি করি, তাহা এইরূপে রূপান্তরিত হইয়া সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারে। দৃষ্টি চাই, প্রচেষ্টা চাই।

লেখক একবার সাঁওতাল পরগণার জামতাড়ায় বেড়াইতে গিয়া এক ভদ্রলোকের বাগানে কলাগাছের বাংলাদেশের মত সৌষ্ঠব ও শ্রী দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া দেখিতেছিলেন। বাগানের মালিক বিশিষ্ট ভদ্রলোক ; তাহা তাঁহার ভাব দেখিয়া ব্যাপার বুঝিযা বলিলেন, "ইহা আপনা হইতেই সম্ভব হয় নাই, এজন্য আমি কিছু চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্ব হইতে বড় বড় প্রশস্ত গর্ত্ত করাইয়া প্রায় ছয়মাস ধরিয়া তাহাতে রাস্তার ঝাঁট দেওয়া যত শুকনা পাতা এবং বাড়ীর খড়কুটা আবর্জ্জনা দিয়া ভরাইয়া রাখিয়াছিলাম। একটা বর্ষা অতীত হইবার পর দ্বিতীয় বর্ষার পূর্ব্বে সেই সকল গর্ত্তে একটী করিয়া কলার তেউড় পুতিয়া দিয়াছিলাম। পাথরের দেশেও তাই না কলার এমন শ্রী।" কত শুকনা পাতা রাস্তার ধারে গড়াগড়ি দিয়া দিক-বিদিকে উড়িয়া যায়, চেষ্টা থাকিলে তাহাকে এইরূপে সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগান যায়।

আমাদের দারিদ্র্যনিবন্ধন এবং উদাসীনতার ফলে খইল এবং হাড় বিদেশীর কবলে দিয়া জমী এখন গোবর সারের উপরই নির্ভর করিয়াছে। সেই গোবর সার রাখিবার দোষে কি ভাবে অপচয় হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। খোলা জায়গায় এবং অনেক সময় ডোবার ধারে গোবর

যেমন জমে রোজ রোজ গৃহস্থ গাঁদা দিতে থাকে। প্রখর রৌদ্রের তাপে তাহার যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় তাহাতে অনেক সার নষ্ট হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া পড়ায় সারের উপযুক্ত রূপান্তরও ঘটে না, তারপর বৃষ্টির জলে তাহার সূক্ষ্ম ভাল অংশ ধুইয়া চারিদিকে চলিয়া যায়। কৃষক সেই সিটা জমীতে চাষের সময় জায়গায় জায়গায় ঢালিয়া সার দেওয়ার তৃপ্তিতে মশগুল থাকিতে পারে কিন্তু ইহার ফলে ফলন বাড়িয়া সম্পদ সৃষ্টি করে না।

বাসগৃহ হইতে কিছু দূরে একটী প্রশস্ত গর্ত্ত করিয়া তাহা গোবর দিয়া উত্তমরূপে লেপিয়া শুষ্ক হইলে তাহার ভিতর প্রত্যহ গোবর, খড়কুটা, গোয়ালের আবর্জ্জনা প্রভৃতি নিত্য ফেলা চলে। প্রখর সূর্য্য কিরণ হইতে এবং বৃষ্টির ধোয়ানী হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর একটী ছোট চালা করিয়া দিলেই চলে। ইহা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয় কিন্তু উপযুক্ত উপদেশ এবং দৃষ্টির অভাবে এইরূপ অনেক লোকসান জাতির হইতেছে।

অপচয়কে কাজে লাগানই সম্পদ সৃষ্টির একটী প্রধান উপাদান। তাই না আজ যত বড় বড় কারখানায় মূল জিনিষের চেয়ে অপচয় হইতে রূপান্তরিত করিয়া bye-product বা আনুসঙ্গিক উৎপাদনই বেশী হইয়া লাভের ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। বড় বড় কারখানায় এই অপচয়কে কাজে লাগাইয়া কত সম্পদের সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া আমরা অবাক্ হই। কিন্তু আমাদের চারিদিকে জীবনের সহজ ক্ষেত্রে করিবার মত যে এইরূপ কত কাজ আছে ভাবি না। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই নিত্য তরিতরকারীর খোসা, কপির উপরভাগের পাতা এবং ভাতের ফেন নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহাদের গরু আছে তাঁহাদেরই কাজে লাগে। প্রত্যেকেরই খাঁটী দুধ দরকার, কিন্তু সহরে এবং পাড়াগাঁয়েও অনেকেই গরু পালনের দায় এড়াইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়াছেন। অবস্থা এমন হইয়াছে শুনিতে পাই, আজকাল খাঁটী দুধ শুধু বাছুরেই খাইতে পায়।

টাকায় চার পাঁচ সের দুধ তাও আবার জল মিশান—শুধু মনকে সান্ত্বনা দিতেই কিনিতে হয়। কিছু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ যদি দুই একটী গরু পালন করেন তবে জাতীয় দুগ্ধ সম্পদ বাড়িবে এবং তরিতরকারীর খোসা ফেন প্রভৃতির নিত্য অপচয় নিবারণ হইবে। কিছু বিচালি এবং খইল কিনিয়া যত্ন করিয়া পালন করিলে গরু আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সম্পদ যোগাইবে।

বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া নিম্ন ও পূর্ববঙ্গে নদী খাল বিলের অবস্থান ও জলধারার গতি ভাল ভাবে লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে স্বাস্থ্য এবং কৃষির সুবিধাজনক অনেক ব্যবস্থা করা যায়। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। দৃষ্টি সহকারে দেখিলে দেখা যাইবে কোন সুবিধামত জায়গায় কায়দা করিয়া বাধ দিলে কৃষির খুব উপকার হইতে পারে। আবার কোথাও বা খানিকটা খাল কাটিয়া নিকটবর্ত্তী নদীর সহিত যোগ করিয়া দিতে পারিলে বহুশত বিঘা বদ্ধ বিলের জল নিকাশ হইয়া অনেক আবাদী ভাল জমি বাহির হইবে। এইরূপে স্বাস্থ্য এবং কৃষির সুবিধামত যোগ বিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেক গ্রামই স্বাস্থ্য, সম্পদ ও শ্রীমণ্ডিত হইবে। গ্রামবাসী, ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলাবোর্ডের মিলিত চেষ্টা এই দিকে দেওয়া বিশেষ দরকার। চাই উপযুক্ত দৃষ্টি, সমবেত চেষ্টা ও অধ্যবসায়।

আমাদের অর্থসমস্যা যখন সঙ্গীন তখন সকল দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সাধনা করিতে হইবে। 'অর্থম্ অনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্' বলিয়া উদাসীন হইলে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ব্যর্থতা ঘিরিয়া ধরিবে। সম্পদ সৃষ্টি করিবার মত উপকরণ দেশে কোথায় কি আছে, অভিনিবেশ সহকারে তাহার সন্ধান লইতে হইবে এবং কুশলতা ও ধৈর্য্যের সহিত কাজ করিয়া তাহা হইতে সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু কৃষির উন্নতি বিশেষ কিছুই হয় নাই ; বরং সম্যক্ সারপ্রয়োগের অভাবে দিন দিন ভূমির উৎপাদিকা

শক্তি কমিয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া বাংলার বিশেষতঃ উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক গ্রামের মধ্যে ও স্থানে স্থানে কতকটা জমি নাটা, বেত, যগডুমুর, শিমুল, কুল, আলকুশী প্রভৃতিতে জঙ্গলময় ও ঝোপে আবৃত হইয়া পতিত আছে; তাহার মাত্রা দিন দিন বাড়িতেছে। এই সকল গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট জঙ্গল গ্রামের সম্পদ বৃদ্ধি তো করেই না, বরং বন্য শূকর, চিতাবাঘ প্রভৃতি বন্য জন্তুর আশ্রয়স্থল হইয়া গ্রামবাসী ও গরু ছাগলের শঙ্কার কারণ হয়; এবং রাত্রে বন্যশূকরের দল ইক্ষু ও ধান্যের বিশেষ অনিষ্ট করে। এই সকল জঙ্গলের বদ্ধ ও আর্দ্র বায়ু গ্রামের স্বাস্থ্যও নষ্ট করে।

এই সকল স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া আবাদে পরিণত করিতে পারিলে দেশের সম্পদ অনেক বাড়ে। বিশেষ করিয়া বহুদিন পতিত থাকায় এবং বনের পাতা পড়িয়া পচিয়া এই সকল জমী খুব উর্ব্বরা,—৬।৭ বৎসর বিনা সারেও এই সকল জমী হইতে পূর্ণভাবে ফসল পাওয়া যায়। লেখক তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে, এই কাজ প্রথমে একটু ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও সেই মূলধন অনেকস্থলে প্রথম বৎসরেই সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া থাকে। নদীয়া জেলার জিয়ারখী গ্রামে লেখক কয়েক বৎসর আগে গ্রামপ্রান্তের একটী গড়-পুকুরের ধারের বহুদিনের জঙ্গল কাটাইয়া, পোড়াইয়া, বড় গাছের মূল বা মোথা তোলাইয়া আবাদে পরিণত করেন। প্রায় দুই বিঘা জমী বহু বৎসর ধরিয়া বেত, নাটা, আলকুশী, বনকুল, সড়া, ডুমুর প্রভৃতি জঙ্গলময় গাছে ঘন-আবৃত থাকিয়া শূকর ও বাঘের আবাসস্থল হইয়া গ্রামবাসীর ভয়ের কারণ ছিল। দিনের বেলায়ও কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। লেখক তাহা উদ্ধার করিয়া পাড়ের উপর কাঁচকলা ও মর্ত্তমান কলা লাগাইয়া দেন এবং নীচের জমিতে পাট লাগান হয়। ইহাতে মোট খরচ পড়িয়াছিল চুয়ান্ন টাকা কিন্তু শুধু এক পাট হইতেই (আট মণ পাট সাড়ে আট টাকা দরে বিক্রয় করিয়া) আটষট্টি টাকা পাওয়া যায় এবং খরচ বাদেও কিছু লাভ থাকে।

কয়েক বৎসর যাবত তাহাতে প্রচুর কলা হইতেছে এবং বিনা সারেও খুব ভাল ফসল হইতেছে। লেখক জঙ্গল কাটান এবং চাষের কাজ নিজে উপস্থিত থাকিয়া করান বলিয়া খরচ বেশী পড়ে নাই।

ঐরূপ জঙ্গলময় জায়গা তো অনেক আছে। গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র সামান্য চাকরীর আশায় ছুটাছুটী করিবার পূর্ব্বে এ বিষয় চিন্তা করিতে সকলকে অনুরোধ করি। একটী গ্রামে যদি জঙ্গলগুলি সমস্ত এইরূপে উদ্ধার করিয়া চার পাঁচ শত টাকা আয় বাড়ান যায় তবে এইরূপ হাজার গ্রামে জাতীয় সম্পদ মোটের মাথায় কত বাড়ে একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

ঐ জিয়ারথী গ্রামের নিকট অনেকটা জায়গা বিল বা জলা পড়িয়া থাকে। খাল সংস্কৃত করিয়া নিকটবর্ত্তী নদীর সহিত যোগ রাখিয়া তাহার যতদূর প্রতিকার হইতে পারে সেজন্য কয়েক বৎসর হইতে সেখানে খুব চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেকটা স্থান অনাবাদী থাকিয়া যায়। এই সকল বিলের ধারের অনেকটা জায়গা প্রায় দেড় ফুট গভীর জল পর্য্যন্ত, ধারের কলমী, শেওলা, পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ পরিষ্কার করাইয়া, চৈত্র মাসের শেষে এবং বৈশাখ মাসের প্রথমে তাহাতে আউস ও আমন ধানের চারা লাগাইয়া দিলে অনেক ধান উৎপন্ন হয়। ইহাতে খরচ খুব কম পড়ে; চাষ করিবার এবং নিড়াইবার খরচ লাগে না, শুধু একবার কি দুইবার ধানের মধ্যের জলজ উদ্ভিদ যেখানে ধানকে ঘিরিয়া ধরে তাহা তুলিয়া দিলেই হইল। অসময়ে কোন কোন বৎসর বেশী বৃষ্টি হঠাৎ হইলে এই ধান নষ্ট হইবার ভয় থাকে; নতুবা বিনা সার প্রয়োগে এবং অল্প পরিশ্রমে এই সকল জলাতে এইরূপে প্রচুর ধান ফলে। লেখক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপে অনেক জলাতে ধান লাগাইয়াছিলেন এবং সেই হইতে ঐ গ্রামে গ্রামবাসীরাই অনেকে তাহা প্রতি বৎসরই করিয়া থাকেন। এইরূপ জলা বাংলার স্থানে স্থানে অনেক আছে; তাহাকে যতদূর পারা যায় কাজে লাগাইতে হইবে। দেখা গিয়াছে বিঘা প্রতি ৭।৮৲ খরচ

পড়ে কিন্তু ৩০।৩৫৲ টাকার ধান ও খড় পাওয়া যায়। অন্য জমির চেয়ে ধান বেশী হয়, কিন্তু জলা জমি বলিয়া খড় খুব কম পাওয়া যায়।

যে সকল জলজ উদ্ভিদ, শেওলা, পানা, কলমী, কচুরীপানা প্রভৃতি তুলিয়া ফেলা হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া মহিষ বা গরুর গাড়ীতে করিয়া কর্ষিত ডাঙ্গা জমিতে সাররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই সকল জলজ উদ্ভিদ এবং লবণ নারিকেল গাছের উত্তম সার। যদি গ্রামের মধ্যের পুকুরগুলির পাড়ে এবং সকলের বাটীর চারিধারে ১০।১২ হাত অন্তর সার বাঁধিয়া নারিকেল চারা বসাইয়া তাহার গোড়া কোপাইয়া এই জলজ উদ্ভিদ দ্বারা বেশ করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায় এবং বৎসরে দুইবার গাছ প্রতি এক সের লবণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কয়েক বৎসর পরে গ্রামে নারিকেল একটী স্থায়ী সম্পদ হইবে। দক্ষিণ এবং মধ্য বঙ্গে এবং পূর্ব্ব বঙ্গে নারিকেল বেশ ভালই জন্মে এবং গোড়ায় প্রথম হইতে লবণ দিতে পারিলে গাছগুলির মাথায় পরে কীটে কচি পাতা কাটিয়া হতশ্রী করিতে পারে না। লবণ সংগ্রামে যেরূপ জোর ধরিয়াছে * তাহাতে আশা করা যায় নারিকেল গাছে প্রচুর লবণ ব্যবহার বেশী শক্ত হইবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, লবণের ব্যয়াধিক্যবশতঃ গরুকেও অনেক গৃহস্থ আবশ্যকমত লবণ ফেনের সঙ্গে দিতে পারিতেছেন না: লবণ সংগ্রামের সাফল্যে তাহারও ব্যবস্থা ভাল হইবে।

নারিকেল গাছ পুকুরের ধারে বসাইলে জলজ উদ্ভিদ বেশী দূর টানাটানিও করিতে হইবে না—একদিকে যেমন পুকুর পরিষ্কার করা হইবে সেই সঙ্গে নারিকেল গাছের গোড়ায়ও সার দেওয়া হইবে। চৈত্র বৈশাখ মাসের রৌদ্রের দিনে, নারিকেল গাছের গোড়া এইরূপ জলজ উদ্ভিদে ঢাকা থাকিলে গাছের বিশেষ উপকার দর্শে।

নারিকেল একটী বিশেষ সম্পদ। খাদ্য হিসাবে ইহা একটী বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য। নারিকেল তৈল আমাদের মহিলাগণের মাথা ঠাণ্ডা রাখে

* ১৯৩০ খৃঃ অঃ লিখিত

(বোধ হয় সাহেবরা ইহা জানিলে মেম সাহেবেরা যখন ঘুমাইবে তাহাদেরও মাথায় মাখাইবে ; কারণ জাগ্রত মেম ইহাদের ভয় ও ভাবনার বস্তু)। নারিকেলের মালা হইতে হুঁকা, লবণ রাখার, হলুদ রাখার পাত্র ইত্যাদি হয় ; ইহার ছোবা বা ছিবাড়া হইতে অতি সুন্দর টেকসই দড়ি প্রস্তুত হয় এবং ইহার পাতার "কাটি" হইতে ঝাঁটা হয় এবং শুকনা পাতার বাকী অংশ উনুন ধরান জালানীরূপে ব্যবহার চলে। গরমের দিনে ডাবের জল ও "নেওয়া" যে কী জিনিষ তাহা বাঙ্গালার অবিদিত নহে। এই সম্পদ দেশে বাড়ান খুব দরকার। ঝুনা (সুপক্ক) নারিকেল মুড়ির সহিত প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে জলখাবাররূপে প্রত্যেকে ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা আদর্শ জলখাবার,—সহজ পাচ্য এবং বিশেষ পুষ্টিকর। মুড়ির সহিত নারিকেল এমন মজে যে অতি আধুনিক নভেলের নায়ক নায়িকারাও তেমন পারেন না। নারিকেলের বহুল আবাদে স্বাস্থ্য এবং সম্পদ দুইই বাড়িবে।

মাঠের মধ্যে দেখা যায় এক একটা যায়গায় বিশেষ কিছু হয় না, অনুর্ব্বর বলিয়া পতিত ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং তাহাতে গরুর ঘাস বা খড়ও ভাল হয় না। এই সকল যায়গায় দেখা যায় বালির ভাগ বেশী এবং শীঘ্র শুকাইয়া উঠে বলিয়া স্বল্প গভীর মূলযুক্ত ফসলাদি হয় না। এইরূপ জমী গ্রাম হইতে একটু দূরে হইলে তাহাতে সেগুন, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান কাষ্ঠের চারা ৮ হাত অন্তর বসাইয়া দিতে হয় কিংবা খেজুরের চারাও ঐরূপ ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে লাগাইয়া দেওয়া ভাল। দুই তিন বৎসর একটু যত্ন করিতে হয়,—যেন গরু বাছুরে নষ্ট না করে, এবং এই সময় মাঝে মাঝে গোড়া পরিষ্কার করিয়া নিড়াইয়া কিছু কিছু সার দিতে হয়। সেগুন, শিশু প্রভৃতি দীর্ঘমূল উদ্ভিদ উপরের অনুর্ব্বর স্তর ভেদ করিয়া অনেক নীচের ভাল মাটী হইতে সার সংগ্রহ করিয়া পরে সমৃদ্ধ হয়। কয়েক বৎসর পরে তাহা গ্রামের এক বিশেষ সম্পদ হইয়া পড়ে। গোড়ার কাণ্ড বা গুড়ি সুঠাম সরল এবং ডালশূন্য করিবার জন্য সেগুন

ও শিশু গাছের গোড়ার দিকের ডাল-পালা অনেক উঁচু পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর কাটিয়া দিতে হয়, তাহা গ্রামের জ্বালানী কাঠের কাজ করিবে এবং সে জন্য গ্রামে কতকগুলি আগাছা পুষিয়া রাখিবার দরকার হইবে না। খয়ের কাঠও গ্রামের গৃহাদির খুঁটীরূপে ব্যবহৃত হয়; তাহাও এ সকল জমিতে হয়। খেজুর গাছ প্রণালীমত ভাল করিয়া লাগান অনেক যায়গায়ই হয় না; কিন্তু একবার করিতে পারিলে কিছুকাল পরে ইহা হইতে বৎসর বৎসর বেশ নিয়মিত "দুইপয়সা" পাওয়া যায়।

এই সকলকে আশ্রয় করিয়া পরে দেশের মাঝে স্থানে স্থানে চিনির কারখানা, নারিকেল দড়ির, সাবানের, নারিকেল তৈল প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। যশোহর জেলায় অনেক খেজুর গুড় হয় এবং সেই জেলার কোটচাঁদপুরের চিনির কারখানার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সম্প্রদায় দিন দিন দুর্দ্দশায় পড়িতেছেন, যুবকগণের মধ্যে বেকার সমস্যা প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু যদি প্রত্যেক গ্রামে সমবায় নীতিতে এইরূপ নানা সম্পদ সৃষ্টির কাজগুলিতে হাত দেওয়া যায় তাহা হইলে সাফল্য আবার দেখা দিবে। অনেক কাজ দেখা গিয়াছে সমবায় নীতিতে বেশী সহজে করা সম্ভব। পুকুর কাটা, জঙ্গল জমি উদ্ধার, সহর ও গ্রামের মধ্যে জিনিষ পত্রের আদান প্রদান ও ছোট খাট কারখানা গড়া, গ্রামের মাঠে অসময়ে জলসেঁচের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ একযোগে করিলে তবে ঠিকমতভাবে ও সহজে হইবে। সমবায় নীতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই সকল কাজে একটী নিবিড় আনন্দ আছে। আনন্দ কর্ম্মে উৎসাহ ও উদ্যম আনে। জঙ্গল জমি কাটাইয়া আবাদে পরিণত করিতে বা বিলের জলার কূলে শ্যামল ধানের শোভা ফুটাইতে বা পুকুরের ধারে সারি সারি নারিকেল তরুর চারু-রেখা গড়িয়া তুলিতে মনে অব্যক্ত এক আনন্দের সঞ্চার হয়। ইহা সৃষ্টির প্রেরণা,—নূতন সৃষ্টির আনন্দগৌরবে মানুষকে বৃহতের দিকে, কল্যাণের দিকে টানে।

শ্রদ্ধেয় আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের অর্থসমস্যা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, বহু সাময়িক প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় দেশবাসীকে তাঁহার অমূল্য অভিজ্ঞতা দান করিতেছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ও নানা প্রতিষ্ঠান, দেশের অর্থসমস্যা সমাধানে অনেক সাহায্য করিতেছে। ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে লিখিত তাঁহার 'মরুভূমিতে সোণা ফলান' হইতে দুই এক যায়গা উপসংহারে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

* * "বারাকপুরে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ৩০।৪০ বিঘা জমির উপর trenching ground (ময়লা ফেলা জমি) করা হয় ও সেই সমস্ত জমি নিলাম করা হয়। পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা তিন চারি হাজার টাকা সেলামী দিয়া সারের জন্য কিনিয়া লয়। আমাদের বাংলার কৃষকেরা এর ধার দিয়াও যায় না। সেখানে হানেফ নামে একজন পশ্চিমা মুসলমান শাক সব্জী উৎপন্ন করিয়া বড় পাকাবাড়ী করিয়াছে।" * * "দৌলতপুর হইতে দুই মাইল দূরে গাঁইকুড় গ্রাম। সেখানে মেনাজ সেখ বাস করে। সে প্রথমে একটী পুকুর কাটিয়া তাহার পাহাড়ের উপর আনারস জন্মায়। অল্প পরিশ্রমে উহাতে প্রচুর আনারস হয় এবং আনারস যেমন বড় তেমনই সুমিষ্ট হয়। দশ পনর বৎসরের মধ্যে সে মোট তিন-চারটী পুকুর কাটিয়াছে। পুকুরের জোরাল মাটীর পাহাড়ের উপর আনারস গাছ লাগাইয়া প্রতি বৎসর সহস্রাধিক টাকা লাভ করিতেছে। তাহার জমির পরিমাণ চার পাঁচ বিঘার অধিক নহে। উহাতে এবৎসর চারি হাজারের অধিক আনারস হইয়াছে, লভ্যাংশ ৮০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা। মেনাজ সেখ বেগুন কুমড়া ঝিঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য তরকারীও উৎপন্ন করে। তাহাতে বারমাস তাহার ব্যবসা চলে। এই আনারসের ব্যবসায়ে সে সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে। আর আমরা ভদ্রলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গোলামী করিতে যাই আর চাষকে চাষার কাজ বলিয়া উপহাস করি।"

জীবন ধারণের জন্য আমরা প্রত্যেকেই যেমন সৃষ্টির সামগ্রী ব্যয় করিতেছি তেমনই আমাদের সকলেরই উচিত কিছু কিছু উৎপন্ন করিয়া সৃষ্টির বা প্রকৃতির এই ঋণ কিছু পরিশোধ করা। খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিয়া, ফলবান বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া, চরকা কাটিয়া বা বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া, আমাদের এই ঋণ শোধ হইতে পারে। যতদিন জগতে একজন লোকও অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে থাকিবে বা পরিধেয়ের অভাবে কষ্ট পাইবে ততদিন কেহই 'আমি মস্তিষ্কের পরিশ্রম করিতেছি' বা অন্য অজুহাতে সৃষ্টির এই ঋণ এড়াইবার নৈতিক হিসাবে অধিকারী নহেন।

ডেনমার্কে সমবায় নীতির সাফল্য

আজকাল বৈজ্ঞানিক ভাবের উন্নত কৃষি পরিচালনের এবং কল-কারখানা ও প্রতিযোগিতার দিনে সমবায় সমিতি Co-operative organization) করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কৃষকের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন। ডেনমার্ক দেশে এই সমবায় নীতি কৃষককে অপূর্ব্ব সাফল্য দান করিয়াছে। মনীষী H. G. Wells তাঁহার বিখ্যাত বই 'Work, Wealth and Happiness of Mankind-এ লিখিয়াছেন—

" It is a fight between the individualist 'family farmer' on the one hand and organisation and (later) machinery on the other. In Denmark the small cultivator has persisted by a surrender of much of his individual freedom to co-operative organisation. He has survived by combination."

সমবায় সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেখানে কৃষক নিজেকে এই জীবন-যুদ্ধে বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছে।

সেখানে এই সমবায় সমিতির কার্য্য এবং প্রসার কিরূপ তাহা গত [১৯৩৩] মে মাসের Modern Review পত্রিকা Young Builder হইতে সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। আমরা নিম্নে বাঙ্গালায় উহার সারমর্ম্ম দিলাম। উহা হইতে সমবায় সমিতির কাজ কিরূপ হওয়া উচিত—তাহার একটী সুন্দর আভাষ পাওয়া যাইবে:—

"ডেনমার্কে কৃষক বিবিধ সমবায় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংযুক্ত। তথায় পল্লীর অধিবাসীগণ তাঁহাদের উৎপাদন করার [বিক্রয়] এবং খরচ

করার [ক্রয়] ক্ষমতা এই দুই দিকেই সমবায়ের সুবিধা লইয়া জিনিষটীকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। সেখানে কৃষির আবশ্যক জিনিষ পত্র কিনিবার জন্য কৃষি ঋণদান সমিতি [Rural Credit Societies] আছে, আবার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয়েয় জন্যও সমবায় সমিতি আছে। সেখানে ক্রয় বিক্রয়ের সমস্ত ব্যবস্থা সমবায় নীতিতে পরিচালিত ; তাহার উপর চালানের ও সরবরাহের সমিতিগুলি [Supply societies] খুব ভাল ভাবে গঠিত [highly organised]। ১৯২০ খৃঃ অঃ সেখানে পাঁচ হাজার সমবায় সমিতি ছিল, ষোল শতের অধিক ক্রয় সমিতি, এগার শত মাখন সর তৈয়ারীর আড়ৎ এবং ইহা ছাড়া বহু কেন্দ্রীয় সমিতি [Central associations], রপ্তানি সমিতি [Export associations] এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা উদ্দেশ্যের সমবায় প্রতিষ্ঠান অনেক ছিল। সেখানে কৃষক তাহার সমস্ত আবশ্যক জিনিষ পত্র সমবায়ের ভাণ্ডার (Co-operative store) হইতে কেনে, সমবায় ঋণদান সমিতি হইতে টাকা ধার করে, সমবায় বীজ সরবরাহ সমিতি হইতে বীজ লয়, সারও সমবায় সমিতি হইতে পায়, সিমেণ্ট সমবায়ের সিমেণ্ট কারখানা হইতে লয়। আর যখন তাহার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রয় করিতে চায়, তাহার দুধ সমবায় দুধের কারখানায় (dairy) পাঠায়, শূকর, খাসি সমবায় পরিচালিত জবাইখানায় (Slaughter-House) পাঠায়, সমবায় ডিম চালান সমিতিতে তাহার ডিম পাঠায়, তাহার গরু মহিষ (cattle) সমবায় পশু চালান সমিতিতে পাঠাইয়া দেয়। সে যাহা কিছু জমায় সমবায় সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দেয়। প্রজননের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পশু কোথায় পাওয়া যাইবে তাহা বিভিন্ন প্রজনন-সমিতির (Breeding societies) নিকটে সে জানিতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সমিতির কাছে জানিতে পায়—কোন্ গরু কত দুধ দিবে। কৃষি সমিতি (Agricultural unions) দ্বারা নিয়োজিত পরামর্শদাতাগণের নিকট সে কৃষি-বিজ্ঞানের আধুনিক (up to date) মত ও তথ্যগুলি

জানিতে পায়। এইরূপে যে সমস্ত সূত্রে বর্ত্তমান কৃষককে জগতের সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয় তাহা সমস্তই এখানে সমবায় নীতিতে পরিচালিত।”

এই সকল কারণে ডেনমার্কের কৃষক শিক্ষিত এবং দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে এই সব সমবায় সমিতিগুলি আরম্ভ করা হয়। তাহার উপর ডেনমার্কে গ্রাম্য উচ্চবিদ্যালয়গুলি (Folk High School) ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে নিজের দেশের সভ্যতার ধারা এবং বিশাল জগতের জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইয়া কৃষকের জীবনে সাফল্য আসিতেছে।

কিন্তু আগে ডেনমার্কে কৃষকের অবস্থা শোচনীয় ছিল। শ্রীযুত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাবপুর, বীরভূম) কিছুদিন আগে (May 1930 অমৃতবাজারে) Small Holdings in Denmark প্রবন্ধে * কি করিয়া কৃষকের এই উন্নতি ঘটিল দেখাইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের ইহাতে অনেকটা হাত আছে। প্রথমে সেখানেও কৃষক আমাদের দেশের কৃষকের মত দরিদ্র ছিল, তাহার নিজের জমি বড় ছিল না, যা-ও ছিল টুকরো টুকরো এ-মাঠে সে-মাঠে, আমাদের দেশের কৃষকের মত ছন্নছাড়া। তাহাকে প্রধানতঃ অন্যের জন্যই চাষ করিতে হইত (যেমন আমাদের বর্গা ভাগে) কাজেই সে বেশ মন দিয়া চাষ করিত না, বা জমির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টাও করিত না। তারপর গভর্ণমেণ্ট যখন সাধারণের হাতে গেল (কৃষকের সংখ্যা এবং কর্ত্তৃত্ব বেশী থাকায়) তখন এইদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন “ The Government realised that these neglected lands were an economical loss to the nation. More men could be well provided in the same area if it was well cared for, instead of overfeeding one

---

* পরে Modern Agriculture নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

individual.” গভর্ণমেণ্ট বুঝিলেন এই অবজ্ঞাত জমি জাতির বিষম অপচয় ; বহু লোকের অন্নসংস্থান ইহার দ্বারা হইতে পারে। তখন সেই সব জমি উদ্ধার করিয়া চাষীর মধ্যে বিভাগ করিয়া এবং আইনের নির্দেশ করিয়া অনেক স্বাধীন কৃষক গৃহ (freeholds) গড়িয়া তুলিলেন। শুধু তাই নয়, বহু টাকা নাম মাত্র সুদে বহুদিনের মেয়াদে সেই সব কৃষকগণের মধ্যে ধার দিলেন, যাহাতে কৃষির উপকরণ কিনিয়া কৃষক দাঁড়াইতে পারে। আজ সেখানে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় আঠার হাজার এইরূপ কৃষিগৃহ (freeholds) গঠিত আর সাধারণের চেষ্টায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার কৃষিগৃহ স্থাপিত। সেখানে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক অবেষ্টনীর মধ্যে মুক্ত আকাশের তলে কাজ করিয়া কৃষকের জীবন সুন্দর ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

ডেনমার্কে পল্লীজীবন

গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের লোকের একনিষ্ঠ চেষ্টায় পল্লীর জীবনও কেমন সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এখানে ডেনমার্ক দেশের পল্লীর কথা, যাহা শ্রীযুত সুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ, গত ১৩২৬ সালের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে 'দিনেমার পল্লী' বিবরণে কর্ণহিল্ ম্যাগাজিন হইতে সুন্দর সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন, তাহার কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এমন একটী আদর্শ অবস্থা বাস্তবে রূপ লইয়াছে দেখিলেও আনন্দ আছে।

"ডেনমার্কের পাড়াগাঁয় যাদের বাস, তারা প্রায় সকলেই সহরের লোকদের সমানই চালাক চতুর, সহরের লোকদের মতোই তাহারাও দেশে বিদেশে কোথায় কি ঘটিতেছে তার খবর রাখে। ডেনিস ভাষায় যখন সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রথম পাঠ প্রকাশিত হয় তখন সহরের লোকদের চাইতে পাড়াগাঁর লোকেরাই সেগুলি বেশী কিনিয়াছিল। পার্লামেণ্টের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী ব্যক্তিরা গ্রামে যেমন হাজারো প্রশ্নের ভীড়ে পড়িয়া বিব্রত হন এমন আর কোথাও হন না। কাজের একটু এদিক ওদিকের দরুণ কোথাও আপত্তিজনক কিছু ঘটিলে গ্রামের লোকেরাই সেই সেই বিভাগের উপরওয়ালাদিগকে কষিয়া জবাবদিহি করিতে বাধ্য করে। সমস্ত ডেনমার্কে এমন একটী বাড়ীও নাই যে বাড়ীতে কেউ একখানিও বই রাখে না, যে বাড়ীতে একখানিও খবরের কাগজ আসে না। সে দেশের যে কোনো চাষা লোক যে কোনো ইংরেজ কৃষকের চেয়ে ইংলণ্ড এবং বৃটিশ উপনিবেশগুলির সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে। এ ত গেল সায়ান্স এবং রাজনীতির কথা। ইহা ছাড়া ইতিহাস এবং সাহিত্যের প্রতিও তাদের টান কম নহে। বিশেষ করিয়া তাদের

নিজেদের দেশের রূপকথাগুলির প্রতি তাদের টান এবং সেগুলিতে তাদের দখলও সহরের লোকদের চেয়ে ঢের বেশী। এতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; কেননা বস্তুতঃ পড়িবার শুনিবার শিখিবার সুযোগ ও সুবিধা সহরের লোকদের চেয়ে তাদের একটুও কম নয়, বরঞ্চ সহরের লোকদের চেয়ে তাদের অবসর বেশী বলিয়া এই সুবিধাগুলিকে তারাই কাজে লাগাইতে পারে বেশী।

সে দেশের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসীদের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তৈরী একটি করিয়া সভাঘর আছে, সেটি সমস্ত গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি। গ্রামবাসীদের নির্ব্বাচিত একটি সঙ্ঘ এই সভাঘরের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এই ঘরটিকে গ্রাম্য-সমাজের মিলনক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। যখনই আর কিছু ভাল লাগে না, মন বিশ্রাম চায়, একটু কিছু পড়িতে ইচ্ছা হয়, কারো সঙ্গে পাঁচরকম কথাবার্ত্তা কহিতে বা বসিয়া বসিয়া পাঁচরকম কথাবার্ত্তা শুনিতে সাধ যায়, তখনি গ্রামের নরনারী এইখানে আসিয়া সমবেত হয়। গ্রামের আকার এবং সমৃদ্ধি অনুসারে সভাগৃহের আকার এবং প্রকারেরও পার্থক্য ঘটে। কিন্তু যতই গরীবিয়ানা মতো হোক আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, গ্রামের সমস্ত বয়োবৃদ্ধের স্থান সঙ্কুলান হয় এমন একটি আলোকিত আরামভরা হল্‌ঘর থাকা চাই-ই চাই। হলের একধারে একটা পাটাতন,—অন্যধারে খানিকটা জায়গা বসিয়া বই-টই পড়িবার জন্য আলাদা করিয়া রাখা হয়, অবশ্য যদি হল সংলগ্ন পৃথক্ পাঠাগার না থাকে। ডেনমার্কে একটুও আত্মসম্মানবোধ জন্মিয়াছে এমন কোন গ্রাম্যসমাজ দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক কাগজ এবং নানাধরণের পুঁথি পুস্তক সম্বলিত একটি পাঠাগার কাছে কোথাও থাকিবে না এমনতর বিপত্তির কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। অবশ্য ইহা হইতে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই যে স্বগ্রামে পাঠাগার না থাকিলে সে দেশের পাড়াগাঁর লোকদের বই পড়া বন্ধ থাকিয়া যায়। যারা দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না এমনতর গরীব লোকেরাও দুচার

পাঁচজনে জুটিয়া একখানি সংবাদপত্রের গ্রাহক হয়, অথবা একখানি বই কিনে; সেই বইটিকে তারপর পালা করিয়া পড়া চলিতে থাকে।

যে সব গ্রামে কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত একটু ভাল, সে সব জায়গার সভাগৃহের আসর সব সময়েই সরগরম। সে দেশে শীতকালটা চাষবাসের কাজ একরকম বন্ধ থাকে বলিয়া যারা মাটি চষিয়া খায় সে সময়টি তাদের থাকে অবসর। তখন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন রাত্রিবেলায় গ্রামের সমস্ত যুবকেরা অঙ্গচালনার উদ্দেশ্যে এই সভাঘরে আসিয়া জোটে; সবাই মিলিয়া ভাড়াকরা স্যাণ্ডোর যন্ত্রপাতিতে পদ্ধতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন রাত্রিতে গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই বক্তৃতা শুনিতে এইখানে আসিয়া মিলিত হয়। প্রতিমাসে কমপক্ষে দুইবার একটা খুব বড় রকমের আলোচনা সভার অধিবেশন হইয়া থাকে, সমস্ত গ্রামবাসীরা এই আলোচনায় যোগ দেয়; মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক ছাত্রেরা সহায়তা করে। নৃত্য-গীত-বাদ্য নাট্যাভিনয় প্রভৃতিও বাদ পড়ে না।

গরীব লোকেরাও বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারে, কেননা বক্তৃতা সভায় প্রবেশের জন্য সচরাচর কিছু দিতে হয় না। যাঁরা বক্তৃতা দেন তাঁরা প্রায় সকলেই অধ্যাপক, ছাত্র অথবা রাষ্ট্রনীতিক; তাঁরা বক্তৃতার জন্য কোনো পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা করেন না। কোনো কোনো স্থলে গ্রামবাসীদের এক একটি কমিটি আছে, তাদের কাজ হইতেছে আশে পাশেকার পল্লীগুলিতে বক্তৃতার জোগান্ ঠিকমতো চলিতেছে কি না দেখা।

একটি নগণ্য পল্লীর এক নিভৃত প্রান্তে ছোট একটি রাজনৈতিক ক্লাব্ গভর্ণমেণ্টের কাজকর্ম্মের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘটিলে চোখ রাঙাইয়া শাসন করিতেছে, এরূপ ব্যাপার সে দেশের কোনো লোককে একটুও চমৎকৃত করে না। সেই ক্লাবের পাশেই হয়ত বন্দুক ছোড়ার কায়দা আয়ত্ত করিবার একটি ক্লাবও আছে, সেখানে দেশের তরুণ যুবকেরা দেশমাতৃকার পূজার মন্ত্রে দীক্ষিত হন্। প্রায় সব গ্রামেই

একটি একটি কৃষি-সমিতি থাকে, সেই সমিতির সভ্যেরা একত্র হইয়া চাষবাসের নূতন প্রবর্ত্তিত উন্নততর রীতি এবং নূতন ধরণের যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। এই কৃষি-সমিতির সংলগ্ন প্রায়ই একটি সমবায় সমিতিও থাকে, গ্রামবাসীদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাহিরে চালান দেওয়া এবং তাহাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাহির হইতে আনিয়া সরবরাহ করা এই সমিতির কাজ। সব সমিতিগুলিই আবার একটিমাত্র "কৃষি বিভাগে"র সঙ্গে যুক্ত। এই কৃষি বিভাগই তাহাদিগকে কৃষি-বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলাফল যথাসময়ে জানাইয়া থাকেন,—এবং সে সমস্ত ভালো করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া দিবার জন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া থাকেন।

কেবলমাত্র এই সমস্ত সভাসমিতি এবং ক্লাবগুলি থাকিলেই দিনেমারদের আর বড় কিছু চাহিবার থাকিত না;—এর উপরেও গ্রামে গ্রামে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় এবং কৃষি বিষয়ক কলেজ বর্ত্তমান থাকাতে সোণায় সোহাগা হইয়াছে। সে দেশের মোট লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের বেশী হইবে না, কিন্তু চাষা গৃহস্থের ছেলেদের জন্য কম করিয়াও পঁচাত্তরটি কলেজ আছে, সে সব কলেজে কেবল যে গৃহস্থের ছেলেরাই শিক্ষা পায় তাহা নহে, শীত ঋতুর অবসরে মজুর কৃষাণেরাও সেখানে ইতিহাস, সাহিত্য, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় শিখিতে আসে। প্রতি বৎসর প্রায় দশ হাজার বিদ্যার্থী—তার তিন ভাগের একভাগ মজুর কৃষাণ—শীতের অবসরের সময় কোনো না কোনো উচ্চ বিদ্যালয়ের সংশ্রবে কাটাইয়া দেয়! তারপর যখন তারা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যায় তখন বক্তৃতা এবং আলোচনার দ্বারা বিদ্যালয়ের অধিগত বিদ্যা আপন আপন পরিচিত লোকদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চেষ্টা করে। আলোচনা-সভাগুলি ডেনমার্কে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। পল্লীর নিস্তব্ধতায় যারা চাষবাস করিয়া দিন গুজরাণ করে তাদের কাছে এই জিনিষটি যে কত

বড় আকর্ষণের বস্তু তাহা বলিতে পারা যায় না।—এই আলোচনা সভার অনুষ্ঠান করিতে সিকি পয়সাও খরচ হয় না,—কিন্তু পল্লীবাসীদের বুদ্ধির ধার বাড়াইয়া দিয়া, বাহিরের ঘটনাবলীর সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্যকে সজাগ সচেতন রাখিয়া উহা সে দেশের যে অসীম কল্যাণসাধন করিয়াছে তাহার মূল্য নিরূপণ করা সহজ নয়।

ডেনমার্ক আজ যাহা হইয়াছে চিরকালই কিছু আর সে তাহা ছিল না। বহু দিবসের অক্লান্ত চেষ্টার পরিণতিতে সে দেশের কৃষক সম্প্রদায় এখন মানুষের মতো হইতে পারিয়াছে।”

চাষের কথা

•যে কোন চাষের কাজ নিজের হাতে করা না থাকিলে ঠকিতে হয়। মজুর কৃষাণ চাষের কাজে এমন ফাঁকি দিতে পারে যে তাহা বলিবার নহে। এজন্য অনেক সময় ভদ্র যুবককে বড় বাগান বা কৃষিকাজে হাত দিয়া লোকসান দিতে দেখা যায়। বড় বাগান বা কৃষিকাজ করিতে হইলে প্রথমে ছোট বাগানে নিজে হাতে সমস্ত করিয়া—মাটী কোপান হইতে শস্য তোলা পর্য্যন্ত—সমস্ত বিষয়ে আগে হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দরকার। কারণ, জানা না থাকিলে নিজের সামনেই মজুরেরা এমন ভাবে জমী কোপাইবে যে তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিবেন না যে তাহাতে ফল ভাল হইবে না। এইরূপ নিড়ানী করা, চারা পোঁতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ঠকিতে হয়। নিজের হাতে সমস্ত রকম কাজ একবার করা থাকিলে কে কতটুকু কাজ করিতে পারে এবং কি ভাবে করিলে ঠিক ভাল ফল হয় তাহা জানা থাকে বলিয়া কেহ ফাঁকি দিতে পারে না এবং ঠিক নিয়মে কাজ হয়।

কৃষি ও বাগানের কাজে নিপুণ দৃষ্টি চাই—আগে পরে সব দিক এক নজরে বুঝিয়া ফেলার মত চোখ চাই; যেমন কপি চাষের জন্য একটী জমি তৈরী করা হইতেছে—ভাদ্র আশ্বিন মাসে যখন পুনঃ পুনঃ চাষ দিয়া বা কোপাইয়া জমি প্রস্তুত হইতেছে তখন হয় তো সেই যায়গায় বেশ রৌদ্র আছে, কিন্তু তাহার খানিক দূরেই দক্ষিণ দিক ভরিয়া বাঁশ ঝাড় বা আম গাছ আছে—শীতকালে কপির শ্রীবৃদ্ধির সময় যে সেখানে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে সরিয়া গিয়া রৌদ্র থাকিবে না, কুশলী দৃষ্টি না থাকিলে তাহা তখন বুঝা যাইবে না—ভাল ভাবে জমি তৈরী করিয়া সমস্ত করা সত্বেও বিফল হইতে হইবে। লেখক নিজে একবার এক ভদ্রলোককে ঐরূপ একটী

জমি কপির আবাদের জন্য তৈরী করিতে দেখিয়া আশ্বিন মাসেই তাঁহার ভুল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আবার অপর একজন ভদ্রলোককেও চন্দ্রমল্লিকা ফুলের জন্য ঐরূপ ধরণের জমি তৈরী আষাঢ় মাসের দিকে করিতে দেখিয়া ভুল বুঝাইয়া দেখাইয়া দেন যে, তখন সেখানে প্রচুর রৌদ্র থাকিলেও শীতকালে ফুলের সময় আওতা হইবে। জমি নির্ব্বাচন করিবার সময় ঋতুভেদে সেখানকার রৌদ্রের অবস্থান এবং বর্ষার জল আগম নিগম ও স্থিতির ব্যাপার বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। জল সেচ, চোর এবং বন্য জন্তুর কথাও ভাবিতে হইবে। যতদূর পারা যায় সকল দিকের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে।

কৃষি ও বাগানের কাজে অভিজ্ঞ লোকের লেখা ভাল ভাল বই বাংলা ভাষাতে বাহির হইয়াছে; তাহাতে নানা প্রকার ফসল সব্জী ফল ফুলের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটী প্রণালী বেশ সুন্দর দেওয়া আছে। সে সব পড়াও দরকার। লেখক নিজে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে মহাশয় লিখিত "কৃষিক্ষেত্র," "সবজী বাগ," "ফলকর," "মালঞ্চ," "মৃত্তিকা-তত্ত্ব" এই বইগুলি পড়িয়া ভাল ফল পাইয়াছেন। আরো অনেক ভাল বই বাংলা-ভাষায় হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেখকের এখনও তাহা পড়িবার সুযোগ ঘটে নাই। ইংরাজীতে লেখা খুব ভাল একটী বই লেখক পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহার নাম,—"The Principles of Soil Management" By Lyon and Fippin (Publishers Macmillan & Co.) আরও কয়েকটী ইংরাজী ভাল ভাল বই পড়িবার সুযোগ লেখকের হইয়াছে, কিন্তু মৃত্তিকা সম্বন্ধে এমন সুন্দর বৈজ্ঞানিক ভাবের লেখা আর চোখে পড়ে নাই।

এই সব বই হইতে চাষের সম্বন্ধে অনেক বিস্তারিত জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, যাঁহারা কৃষি এবং বাগানের কাজ করিবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য লেখকের যাহা অভিজ্ঞতা আছে এবং মোটামুটি যাহা মনে পড়ে তাহা জানাইয়া দেওয়া মাত্র।

এক এক যায়গায় এক এক জিনিস জলবায়ু ও অবস্থার গুণে ভাল জন্মে, তাহার সুবিধা গ্রহণ করা দরকার; যেমন দক্ষিণ বঙ্গে নারিকেল ভাল জন্মে, উত্তর বঙ্গে তামাক, সুপারী ভাল হয়, নদীর চরের ধারে পটল, তরমুজ, কলাই, মুগ ভাল হয়। সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মানভূমে অনেক নীরস-ডাঙ্গা পতিত আছে। সেখানে চাষের অবস্থা প্রতিকূল—কেবল বাবুই ঘাস (Savoy Grass) আবাদ চলে। বাবুই ঘাসের দড়ি খাটীয়ায় ও অন্যান্য কাজে এই সব দেশে ব্যবহৃত হয়। বিস্তৃত-ভাবে আবাদ করিলে শুনিয়াছি কাগজের কলেও চালান দেওয়া চলে। এই কষ্টসহিষ্ণু ঘাসের জন্য জল সেচের দরকার হয় না। প্রথমবার আষাঢ় মাসের প্রথমে জমি ভাল করিয়া চষিয়া দুই হাত অন্তর লাইন করিয়া সেই লাইনে দুই হাত অন্তর একটী দুইটী ঘাসের ফেকড়ী পুঁতিয়া দিলেই হইল। ২।১ বছর পরেই তাহা ঝাড়ে পরিণত হইবে এবং প্রত্যেক ঝাড় হইতে প্রতি বৎসরে দুইবার তিন পয়সা চারি পয়সার মত ঘাসের আঁটী কাটা যাইবে। ইহার কোন তদ্বির নাই, শুধু বর্ষার আগে একবার চাষ দিয়া দিলেই হইল। যাঁহাদের অকেজো এরূপ বিস্তৃত ডাঙ্গাল পড়িয়া আছে তাঁহারা ইহা করিতে পারেন। বৎসরে খাজনা ও খরচা বাদেও বিঘা প্রতি ৮।১০ টাকা আয় হইতে পারে। এইরূপ ডাঙ্গালগুলির কতকটা ঢালু অংশে চীনাবাদামের আবাদও চলে; এই সব বালিযুক্ত শুষ্ক দেশে চীনা বাদাম মন্দ হয় না। চীনা বাদাম কখনও ঘন লাগাইতে নাই, তাহাতে ফলন কম হয়। ভাল করিয়া জমি চষিয়া অন্ততঃ দেড় হাত অন্তর একটী একটী চীনাবাদাম লাগাইয়া দিতে হয়—সুটী ছাড়াইয়া দানা আলাদা করিয়া একটী একটী লাইন ধরিয়া বসাইয়া যাওয়া ভাল। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই এক পশলা বড় বৃষ্টি হইবার পরই লাগাইতে হয়; আর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই জমিতে সামান্য রস থাকিতে থাকিতেই তুলিয়া ফেলিতে হয়,—দেরী করিয়া তুলিলে জমির রস শুকাইয়া মাটী কঠিন হইলে তুলাইবার মজুরী বেশী

পড়ে। চীনা বাদামের মধ্যে ৮।১০ হাত অন্তর একটী করিয়া কার্পাস তুলার গাছ লাগান চলে। চীনাবাদামের মত পুষ্টিকর খাদ্যের চাষের প্রসার হওয়া দরকার। বিঘা প্রতি ৮।১০ মণ ফলন অনায়াসে হয়। খরচ ও খাজনা বাদে বিঘা প্রতি কুড়ি পঁচিশ টাকা লাভ হয়। আগে এ দেশে চীনা বাদামের চাষ ছিল না। পনের কুড়ি বৎসর মধ্যে ইঁহার বিস্তৃত আবাদ উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতে হইয়াছে,—এবং ইহার কল্যাণে ঐ সকল দেশের বহু সহস্র বিঘা শুষ্ক, অনুর্ব্বর পতিত ক্ষেত্র আবাদে পরিণত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে। চীনা বাদাম ও বাবুই ঘাস ছাড়া, সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মানভূমের কতক যায়গায় পেঁপে, আতা ও পেয়ারা ভাল জন্মে দেখিয়াছি। চালান দিবার সুবিধাজনক যায়গায় বিস্তৃত আবাদ করিলে লাভ হইতে পারে। ভাল ভাল আমের কলমের ছোট চারা গাছ বসাইবার সময় অনেকে ঘটা করিয়া নানারকম সার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহাতে অনেক সময়েই অনিষ্ট ঘটে—সার রৌদ্রে ভিতরে উত্তপ্ত হয়, কিংবা নানা প্রকার জীবাণুর উপদ্রবে নূতন লাগান গাছের অনিষ্ট হয়। এজন্য চারা গাছ শুধু মাটিতে বসাইয়া দিতে হয়—এক বৎসর পরে গাছ ভাল লাগিয়া গেলে বর্ষার আগে গোড়া খুঁড়িয়া মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া সার দিতে হয়।

কোন কোন যায়গায় উইয়ের বড় উপদ্রব ; সেই সব যায়গায় গোবর সারের সঙ্গে একের ষোল অংশ চুন বেশ গুঁড়া করিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া দিলে সুফল হয়। এই কাজে ঘুটিং এর চুণই প্রশস্ত। গোলাপ গাছের পক্ষে ইহাতে দুই দিকে উপকার হয়, সার হিসাবে এবং উইয়ের উপদ্রব নিবারণেও। চুন ও গোবরের সারের এইরূপ মিশ্রণ সার হিসাবেও খুব মূল্যবান ; লিচু, আম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছেও ভাল। চায়ের সীটাও (যাহা চা ছাঁকিয়া লওয়ার পর প্রত্যহ ফেলা যায়) গোলাপের ভাল সার। একটী ঝুড়িতে প্রত্যহ অল্প অল্প যেমন জমে জমাইয়া বেশী হইলে গাছের গোড়ায় দেওয়া চলে।

মাছ কুটিবার পর মাছের আঁশ, পিত্ত প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিয়া অনেক বাড়ীতে নষ্ট করা হয়; উহাতে আবর্জ্জনা ও অস্বাস্থ্য সৃষ্টি হয়। বাড়ী হইতে কিছু দূরে একটা নির্দ্দিষ্ট গর্ত্তে প্রত্যহ ফেলিয়া সামান্য শুকনা মাটী ও ছাই চাপা দিয়া প্রত্যহ রাখিলে কিছুদিন পরে অনেকটা মূল্যবান সার পাওয়া যায়। এইরূপ সারে ফসফেট ও নাইট্রোজেন অনেক বেশী থাকে; ফলবান বৃক্ষের গোড়ায় দিলে সুফল ফলে। অনেক যায়গায় লাউ, কুমড়া গাছের গোড়ায় মাছ ধোয়া জল দিবার রীতি আছে, তাহাতে ফল ভাল হয়।

বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র থাকিলে যদি এক ধারে বড় গাছ বা বাঁশঝাড় বসাইতে ইচ্ছা হয়, কি দরকার থাকে, তাহা যেন উত্তর ধারে বা পশ্চিম ধারে একেবারে সীমানা ঘেঁষিয়া লাগান হয়, তাহা হইলে জমির ক্ষতি বেশী হইবে না; বরং পশ্চিমের ঝড় ও গ্রীষ্মের সময়কার উত্তরদিকের রৌদ্র, ও শীতের উত্তর বাতাস কতক আটকাইয়া ফল ভালই হয়।

কৃষিকাজে শুধু গতানুগতিক ভাবে সন্তুষ্ট থাকিলে উন্নতি হয় না। প্রত্যেক জিনিসের সবচেয়ে ভালটা উৎপন্ন করিতে পারিলে তবেই কাটতি বেশী হয় এবং ভাল দাম পাওয়া যায়। যাহার ডাঁটা, মূলা, বেগুণ ভাল এবং মিষ্টি, বাজারে তাহার জিনিষের চাহিদা বেশী হয়। একঝুড়ি সুমিষ্ট পোকাশূন্য আমে যে দাম পাওয়া যায় তিনঝুড়ি খারাপ আমেও তাহা হয় না। এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জিনিস যেখানে যাহা আছে উদ্যোগী হইয়া তাহার বীজ এবং কলম সংগ্রহ করিয়া লাগাইতে হয়। এইরূপ উদ্যমে দুই একজনকে বিশেষ ফললাভ করিতে দেখিয়াছি। বগুড়াতে জনপ্রিয় ডাঃ সুধীর বাবু তাঁহার নার্সারীতে হাওই দ্বীপের আনারস ও সিঙ্গাপুরের আনারস আনিয়া আবাদ করিয়া একটি নূতন সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে ২।১টী গাছ সংগ্রহ করিয়া তিনি আরম্ভ করেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার নিজের ক্ষেতে বহু গাছ হইয়াছে। হাওই আনারস স্বাদে ও আকারে এমন সুন্দর যে, এক একটা আনারস দশ আনা বার আনায় এই সস্তার

দিনেও বিক্রয় হয়, এক একটি চারা আট আনায় বিক্রয় হয়। গাছগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। বাংলার আবহাওয়াতেও সুন্দর জিনিষ হইতেছে। যে বুদ্ধিমান, সে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতত ভাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জিনিষ উৎপন্নের দিকে নজর রাখিবে।

কৃষিকাজে পিছে পড়িলেও ঠকিতে হয়। একদফা জিনিষ যাহাতে প্রথমে বাজারে আমদানী করা যায় সেই চেষ্টায় থাকিতে হয়। পটল, ডাঁটা, কপি, বেগুণ, মূলা প্রভৃতি সব জিনিষই যখন প্রথম বাজারে উঠে তখন তার দর বেশী থাকে। ইহার সুবিধা গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। ভাল চাষী সর্ব্বদা সে সুযোগ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী থাকে।

কলার চাষ

অন্য সমস্ত প্রকার চাষের অপেক্ষা কলার চাষ ভদ্র যুবকের পক্ষে বেশী উপযোগী, কারণ ইহাতে পরিশ্রম কম অথচ আয় বেশী। অনেক জায়গায় কলাচাষ হইতেছে কিন্তু কলার দাম বরং দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। ইহা সকলেরই প্রিয় খাদ্য; যত উৎপন্ন হইতেছে সঙ্গে সঙ্গেই সে সব ফুরাইতেছে, চাহিদা দিন দিনই বাড়িতেছে। সাহেবরা তো কলা বলিতে অজ্ঞান; পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, গুজরাটী, হিন্দুস্থানী সকলেরই কলাপ্রীতি প্রগাঢ়।

কলা বাংলা দেশে ভালই ফলে। একটু উঁচু জমি চাই, যেন বর্ষার জল না জমে। দোআঁশ এবং এঁটেল মাটীই ভাল। আট হাত অন্তর বড় বড় গর্ত্ত করিতে হইবে। গর্ত্ত ছোট করিলে চলিবে না। এক হাঁটুর কিছু উপর অর্থাৎ আড়াই ফুট গভীর ও দুই হাত চওড়া ও গোল করিয়া গর্ত্ত করিতে হইবে। গর্ত্ত ওসারে বা প্রস্থে কম হইলে কলাগাছ ভালরূপ "পোয়া" বা তেউড় ছাড়িয়া বাড়িতে পায় না আর গাছের গোড়ায় অনেকটা আলগা মাটী না থাকায় বৃদ্ধি কম হয়। মাঘ ফাল্গুন মাসই কলার তেউড় পুতিবার ঠিক সময়। মাঝারি অর্থাৎ একমানুষ উঁচু তেউড়ই ভাল। লাগাইবার আগে তেউড়ের গোড়ায় শিকড়গুলি এবং ভাঙ্গা ফাটা অংশ ধান-কাটা কাঁচি দিয়া চাঁচিয়া দিতে হইবে। তেউড়ের গোড়াটী উপনয়নের পূর্ব্বের নেড়ামাথার মত দেখিতে হইবে। আর আগায় পাতা থাকিলে তাহাও কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিতে হইবে—শুধু মধ্যের মাঝ-পাতাটি থাকিবে।

তারপর গর্ত্তের ঠিক মধ্যখানে বসাইয়া সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিয়া পার্শ্বের মাটি দিয়া গর্ত্তটী অর্দ্ধেক ভরাট করিয়া পা দিয়া গাছের চারিদিকের মাটী বেশ করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। তৎপর প্রত্যেক গর্ত্তে এক ঝুড়ি

করিয়া এক বৎসরের পুরাতন ছাই (পাথুরে কয়লার ছাইও চলিবে) ঢালিয়া দিতে হইবে। তৎপর যদি পাওয়া যায় পুকুরের কি নর্দ্দামার পাঁক (আধ শুক্‌না বা শুষ্ক) এক ঝুড়ি করিয়া গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। তৎপরে গর্ত্তের যেটুকু বাকী থাকিবে তাহা উপরের মাটি পূরণ করিয়া বেশ করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে—পা দিয়া ভাল করিয়া চাপিলেও চলে কিংবা খোন্তার গোড়ার দিক দিয়া শিলাইয়া মাটী চাপিয়া দিতে হইবে। কলা গাছ লাগাইবার সময়, গোবর সার দেওয়া ভাল নয়—কেঁচো লাগিয়া গাছ খারাপ হইতে পারে। ছাই এবং পুরাতন পুকুরের পাঁকই কলা গাছের ভাল সার।

বাজে কলা বেশী লাগাইয়া লাভ নাই। "মর্ত্তমান" বা "সবরী" বা "মাল ভোগ" কলা এবং কাঁচা কলাই ভাল এবং এসবের দাম বেশী। ইহারই বেশী আবাদ করা ভাল। ভাল কলার তেউড় বেশী না পাওয়া গেলে, যতগুলি পাওয়া যায় তাহা লাগাইয়া পর বৎসর সেই সব গাছ হইতেই অনেক তেউড় পাওয়া যাইতে পারে। গাছ বসাইবার পর ভাল করিয়া ঘিরিয়া রাখা ছাড়া ২।৩ মাস মধ্যে আর কোন পাট নাই। বৈশাখ মাসের প্রথমে একবার ভাল বৃষ্টি হইবার পর সমস্ত বাগানখানি একবার কোপাইয়া দিতে হইবে। ২।৩ মাসের খরায় (শুষ্ক আবহাওয়ায়) তেউড়গুলি উপরে শুষ্কপ্রায় দেখায়। বৈশাখের প্রথমে কি মাঝামাঝি বৃষ্টি হইবার পর নূতন কচি পাতা বাহির হইতে থাকে। তখন উহার মধ্যে যে তেউড়গুলি একটু লম্বা তাহাদের গোড়া ঘেঁসিয়া ধান কাটা কাঁচি দিয়া কাটিয়া দিতে হয়। এই কথাটী মনে রাখা দরকার যে, কলা গাছের যখনই কোন কাটা কুটি করিতে হয় তখন ধান কাটা কাস্তে দিয়াই যেন তাহা করা হয়; কারণ কাঠারী দা বা অন্য অস্ত্রে কলাগাছের অংশ কাটিলে থেতলাইয়া গাছ জখম হয়। তৎপর সেই কর্ত্তিত গোড়ার মধ্যে দুই ইঞ্চি মত (যেখান দিয়া মাঝ পাতা বাহির হইবে) বাদ দিয়া বাকী অংশ "থেটে" বা বাঁশের গোড়া দিয়া সাবধানে থেঁতলাইয়া দিতে হয়। এইবার নূতন জোরাল পাতা ফুঁড়িয়া

বাহির হইতে থাকিবে। আষাঢ় শ্রাবণ মাস মধ্যে সমস্ত বাগানটী তেজাল গাছের নূতন পাতায় ভরিয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিবে। একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কলা গাছের পাতা যেন কাটা না হয়,— শুধু যখন যে পাতা শুকাইয়া আসিবে কেবল সেই পাতাটীই কাস্তে দিয়া কাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

ইতিমধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসে আর একবার বৃষ্টি হইবার পর সেই জমিতে দ্বিতীয় বার কোপান দিয়া দুই হাত অন্তর কলা গাছের মধ্যে "আকাশে মরিচের" চারা বসাইয়া দিতে হইবে। আকাশে-লঙ্কা ছায়াতে ভাল হয়, এজন্য কলাগাছের মধ্যে লাগাইলে একসঙ্গে দুই ফসলের লাভ হয়, এমন কি বাগানের সমস্ত খরচ 'আকাশে লঙ্কায়' উঠিয়া আসে এবং কলার আয় সমস্তই লাভে দাঁড়ায়। আকাশে লঙ্কার গাছও দুই তিন বৎসর একই গাছে পূরা ফল দেয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে ছায়াযুক্ত স্থানে হাপোর করিয়া ভাল আকাশে-লঙ্কার বীজ হইতে চারা দিতে হয়। বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের পর তুলিয়া কলাক্ষেতের মধ্যে বসাইয়া দিলেই চলে। শ্রাবণ মাসের প্রথমে একবার আকাশে মরিচের গোড়ার ঘাস এবং আগাছা নিড়াইয়া দিলেই চলিবে। এই সময় হইতেই লঙ্কা ফলিতে আরম্ভ হয়; ভাদ্র আশ্বিন মাসে পাকা লঙ্কা বিক্রী আরম্ভ হইবে। লঙ্কা দ্বিতীয় বৎসরেই বেশী ফল দিবে।

বৎসরে একবার করিয়া, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, বর্ষার পূর্ব্বে, গোড়া কোপাইয়া একঝুড়ি করিয়া ছাই, পুরাতন পুকুরের পাঁক কিংবা পাতা পচা সার প্রত্যেক কলাঝাড়ের গোড়ায় ঢালিয়া দেওয়া ছাড়া কলাগাছের আর কোন পাট নাই। কলাগাছে মোচা আসিলে ৭।৮ ছড়ি কলা ছাড়ার পর যখন মোচার ছড়ি ঝরিয়া পড়িতে সুরু করে তখনই মোচাটী ভাঙ্গিতে হয় এবং ভাঙ্গা অংশে যাহাতে রস পড়িয়া কাঁদী দুর্ব্বল না হয় এজন্য খানিকটা আটাল মাটী কিছুক্ষণ চাপিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। কলার কাঁদী বেশ পুষ্ট

হইয়া গাছ হেলিয়া পড়িলে বা ঝড়ে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিলে; দুইটী বাঁশকে এড়ো করিয়া বাঁধিয়া গাছে ঠেক্‌নো দিতে হয়। কলার কাঁদীতে দুই একটী কলায় রং ধরিলে কাটিয়া আনিয়া ঘরে রাখিতে হয় এবং গাছটীকে গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া দিতে হয়। ২।৩ মাস পরে সেই গোড়াটী (এঁটে) পচন ধরিলে খুঁড়িয়া তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং স্থানটী মাটী দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হয়।

এক বিঘাতে আট হাত অন্তর কলা বসাইলে একশত ঝাড় কলা হইবে। বিঘা প্রতি পচাত্তর টাকা হইতে একশত টাকা লাভ হইতে পারে। কলাগাছ বর্ষাকালে বসান কোনমতে উচিত নয়। মাঘ হইতে বৈশাখ মাস কলার তেউড় বসাইবার প্রশস্ত সময়। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বীরভূম প্রভৃতি শুক্‌নো উঁচুদেশে কলা ভাল হয় না; এ সব যায়গায় কলা লাগাইতে হইলে আষাঢ়ের প্রথমেই তেউড় বসান ভাল। এক ঝাড়ে চারিটীর অধিক গাছ রাখা ভাল নয়। বেশী পোয়া বা চারা যাহা হইবে তুলিয়া আলাদা লাগাইয়া দেওয়া ভাল; নিজের জায়গা না থাকিলে বিক্রয় করিয়া দেওয়া বা প্রতিবেশীকে বিলাইয়া দেওয়া উচিত। ঝাড় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ভাল কলা দেয়; এজন্য চতুর্থ বা পঞ্চম বৎসরে জায়গা বদলাইয়া নূতন জায়গায় কলার আবাদ করা ভাল।

রেশমের কথা

• রেশম শিল্প এদেশের বিশেষ করিয়া বাংলার একটী প্রাচীন শিল্প। চীন দেশ আদিম উৎপত্তি স্থল হইলেও ক্রমে জাপান ও এদেশ হইয়া আরব তুর্কীস্থান প্রভৃতি হইয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহার প্রবর্ত্তন হয়। ইহা এক সময় বাংলার একটী প্রধান শিল্প ছিল। নিজের দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া বহু টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়া দেশে বহু অর্থাগম হইত। কিন্তু গত শতাব্দী হইতে ইহার অবনতি হইয়া এখন দশা শোচনীয় হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের অভাব, সমবায়নীতি পরিচালনে অজ্ঞতা, এবং গভর্ণমেণ্টের উপযুক্ত যত্নের ত্রুটী। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, বীরভূম, বাঁকুড়া এই সব জেলায় স্থানে স্থানে এখন রেশম শিল্পের চাষ হয় বটে, কিন্তু অন্য দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিয়া ইহার যে বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে তাহার তুলনায় উহা নগণ্য। আজ কাল জগতের রেশমের বাজার জাপান ও চীন দ্রুত দখল করিতেছে। ইউরোপের অনেক জায়গায় বিশেষ ফ্রান্সে নকল বা কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) সস্তায় তৈরী হইলেও তাহা টেকসই এবং অন্যান্য গুণে স্বাভাবিক রেশমের অনেক নীচে। আসল রেশমের চাহিদা এ জন্য দিন দিন বাড়িতেছে। আমাদের দেশের গ্রামের উন্নতি এবং আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের এই প্রাচীন শিল্প কিসের অভাবে এখন হতশ্রী হইল তাহা সন্ধান করা ও আলোচনা করা উচিত।

মান্দালয় কৃষি কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষ জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি দেশে নিজে গিয়া রেশম শিল্প সম্বন্ধে

অনেক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি বই "বাঙ্গালার সমস্যা" ও "জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে" সুচিন্তিত ও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। "বাঙ্গালার সমস্যায়" তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"শিল্পে উন্নতি করিতে না পারিলে দেশ দরিদ্র থাকিবেই। একমাত্র রেশম শিল্প দ্বারাই জাপানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোক জীবিকা অর্জ্জন করে এবং ইহাই জাপানের প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাগমের উপায়।"

রেশম তৈরীর প্রণালীর মোটামুটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এখানে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রেশম উৎপন্ন করা কত দরকারী। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী চালাইতে হইলে তাহা ব্যয় সাপেক্ষ, এবং এইরূপ ব্যয় বহন সমবায়নীতিতে বা সহানুভূতিপরায়ণ গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই হওয়া সম্ভব। যেমন উৎকৃষ্ট ও রোগবীজাণুশূন্য রেশমকীট বা বীজ সরবরাহের জন্য দেশের মধ্যে কয়েকটী স্থানে ব্যবস্থা থাকা দরকার; ইহা করিতে হইলে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমান উন্নত প্রণালীতে বীজ বা কীট উৎপাদনের ব্যবস্থা সেই সকল স্থানে রাখিতে হইবে। এ জন্য যে ব্যয় পড়িবে তাহা একজন রেশম উৎপন্নকারীর পক্ষে বেশী পড়ে। কয়েকটী গ্রামের সমবায় সমিতি হইতে এইরূপ এক একটী ব্যবস্থা হইতে পারে কিংবা গভর্ণমেণ্ট দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ইহা করিতে পারেন।

রেশম তৈরীর ব্যাপারটীও বেশ কৌতূহলজনক। প্রজাপতি জাতীয় এক রকম কীট তুঁত গাছের পাতা খাইয়া বর্দ্ধিত হয়। কিছু দিন এইরূপে বর্দ্ধিত হইয়া মুখ হইতে আঠাযুক্ত সূতাবৎ সূক্ষ্ম পদার্থ বাহির করিয়া অনবরত মাথা ঘুরাইয়া নিজের চারিদিক জড়াইয়া গুটী প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ করে। এই গুটী আর কিছু নয়, জড়ান রেশম। পোকা উহার ভিতর কিছু কাল মৃতবৎ বিশ্রাম করিয়া প্রজাপতিতে পরিণত হইলে একদিকের অংশ কাটিয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যায়। এ জন্য সূতা অখণ্ডভাবে পাইতে হইলে ভিতরের পোকাটীকে

দমবন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। তারপর গুটীর পাক খুলিয়া কোন উপযুক্ত লাটাইতে জড়াইয়া লইলেই রেশম তৈরী হইল। পরে স্থূলতার প্রয়োজন মত উহা ৪।৫ খেই বা বেশী খেই একসঙ্গে পাকাইয়া লইয়া তাঁতে বয়ন করিলে রেশমের কাপড় হয়।

• যে সব গুটী হইতে ভবিষ্যৎ রেশম বীজ উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা প্রথম হইতেই আলাদা করিয়া রাখিতে হইবে। কালক্রমে ভিতরের কীট উহার একদিক কাটিয়া বাহির হইয়া আসিবে এবং বাহিরে আসিবার কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই স্ত্রীপুরুষ (চোকড়া চোকড়ী) একত্রে মিলিত হইয়া স্ত্রী-কীটের গর্ভসঞ্চার হয়। স্ত্রী-কীটগুলিকে তখন আলাদা সংগ্রহ করিয়া ছোট ছোট কাপড়ের থলিতে ভরিয়া ফেলা হয়। তাহার ভিতর কয়েকদিনের মধ্যে ডিম পাড়িয়া স্ত্রী-কীটটী মরিয়া যায়। তারপর দুই চারিটী থলির বীজ বা ডিম থলি হইতে বাহির করিয়া জলে ধুইয়া মৃত প্রজাপতিটীর দেহাংশ ও অন্যান্য ময়লা দূর করিয়া ফেলা হয়। উহা হইতে কয়েকটী বীজ বা ডিম পিষিয়া ফেলিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরিয়া দেখা হয়, যদি সমস্তগুলিই ব্যাধি ও রোগজীবাণুশূন্য দেখা যায়, তবে সেই বীজ ভবিষ্যৎ প্রজননের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হয়। এইরূপ সম্পূর্ণ ব্যাধিশূন্য বীজই ব্যবহারের এবং বিক্রয়ের উপযোগী। পরীক্ষায় শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগজীবাণুযুক্ত দেখা গেলেই সেই সব থলির সমস্ত বীজই পোড়াইয়া ফেলা হয়। কারণ কটা বা পেব্রিণ নামক মারাত্মক রোগ ও অন্যান্য রোগ চোকড়ীর (স্ত্রী কীটের) শরীর হইতে পলুর (সন্তান কীটের) শরীরে সংক্রামিত হয়। জীবাণু-বিজ্ঞান এবং অণুবীক্ষণ-যন্ত্র এখানে মানুষকে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আগের মত চাষীকে এখন আর হতাশ হইতে হয় না। সাধারণ কৃষকের পক্ষে এইরূপ পরীক্ষা সম্ভব নয় বলিয়া জাপানে কৃষককে ডিম উৎপাদন করিতে দেওয়া হয় না। গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সমস্ত ডিম উৎপন্ন হয়। প্রায় আট হাজার লোককে ডিম উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া আছে ; ইহাদের

প্রত্যেককে ডিম উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট গবেষণা কেন্দ্র হইতে নিখুঁত ডিম দেওয়া হয়।

চাষীরা সেই সব বিশ্বস্ত লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিম উৎপাদকের নিকট হইতে ডিম ক্রয় করিয়া কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায়ে (incubator দ্বারা) ফুটাইয়া লয়। পাতলা একটী পাত্রে ডিম রাখিয়া তলায় উত্তাপ ৬৫ ডিগ্রি হইতে ক্রমে ৭৭ ডিগ্রিতে তোলা হয়। ইহার সুবিধা এই, সমস্ত ডিম একসঙ্গে ফোটে ; এ জন্য ইহাদের প্রতিপালন ও গুটী তৈরী কম খরচে হয়। তারপর তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট একটি ঘরে রাখিয়া প্রতিপালন করা হয় ; ঐ ঘরের তাপ যাহাতে ৭৭ ডিগ্রি মত থাকে তাহা করা হয়। ঘরটীতে যেন প্রচুর আলো বাতাস থাকে অথচ ভিতরে রৌদ্র আসিয়া পলুর গায়ে যেন না লাগে। জানালা দরজা যথেষ্ট থাকিবে, সেগুলি মাছি প্রভৃতি প্রবেশ করিতে না পারে এইরূপ খুব সরু ছিদ্রযুক্ত তারের জালে আটকান থাকে। বাঁশের ডালা বা পাতলা কাঠের ট্রেতে রাখিয়া এই সময় পলু বা পোকাদিগকে তুঁত গাছের কচি পাতা খাইতে দেওয়া হয়। পাতা প্রথমে শাকের মত খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে অল্প অল্প খাইতে সুরু করে তারপর ক্রমশঃ একটা পোকায় দৈনিক ২।৩টী পাতা খাইয়া ফেলে। এইরূপে ৪২ দিন ধরিয়া ইহাদের পালন করিতে হয়। খাদ্যের জন্য প্রচুর সতেজ কচি পাতার যোগান রাখিতে বিস্তৃত-ভাবে তুঁতের চাষ রাখিতে হয়। এই ৪২ দিন মধ্যে আবার পোকারা চারবার ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী নিদ্রা যায়। জন্মের ষষ্ঠ, দ্বাদশ, অষ্টাদশ এবং চতুর্ব্বিংশতি দিবসে ইহারা নিদ্রা যায়, সেই সময় কোন কিছু খায় না। এই জন্য বিশেষ করিয়া একসঙ্গে যন্ত্র-সাহায্যে (incubator দ্বারা) সব ডিম একেবারে ফুটাইয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়। বিশ্রামের সময় পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়, একসঙ্গে সকলের নিদ্রার সময় না হইলে বড়ই অসুবিধা ও অপব্যয় হয়। এই বিয়াল্লিশ দিন পরে তাহারা জীবনের প্রধান কাজ আরম্ভ করে—মাথা তুলিয়া ঘুরাইয়া গুটী করে।

এই সময় ভিতরে ঘুরান খাঁজ-কাটা কাটা বড় ডালার ভিতরে ছাড়িয়া দেওয়া হয় কিংবা ঘরের মধ্যে শুকনা ডালপালায় আটকাইয়া দেওয়া হয়: এই সবের ভিতর একদিন দুইদিন মধ্যেই সকলে গুটী বা কোয়া তৈরী করে।

কোন কোন যায়গায় ভিতরের পুত্তলীকীটকে (Chrysalides) নষ্ট করিবার জন্য গুটী প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দেওয়া হয়। ইহার এই দোষ যে, গুটীর আঠা শুষ্ক হইয়া রেশম খুব আঁটিয়া যায়, জড়াইবার সময় অনেক নষ্ট হয়; তাহা ছাড়া সূর্য্যোত্তাপে বর্ণেরও হানি হয়। এই প্রথা লোকসানজনক। অনেক জায়গায় আবার গরম জলে বা উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের ভিতর এই কাজ হয়। আট দশ মিনিট এইরূপ রাখিলে ভিতরের কীট বা পুত্তলী মরে সত্য, কিন্তু ভিতরের পচন নিবারণ করিতে গুটী এক মাস দেড় মাস ধরিয়া শুক্নো হাওয়ায় শুকাইতে হয়, সেই সময়ে আবার প্রত্যহ দুই বেলা প্রত্যেক গুটীর উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হয়। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ এবং অনেকদিন মেলা থাকায় গুটীও ধূলাতে কিছু মলিন হয়। এই প্রণালীতে ২।৪টা গুটীর পোকা আবার তাজা থাকিয়া যায়; তাহারা গুটী কাটিয়া সেই সব গুটী লোকসান করে। সব চেয়ে ভাল বিজ্ঞানসম্মত উপায় হইল, বিশেষভাবে তৈরী বদ্ধস্থানে সাজাইয়া রাখিয়া গুটীগুলির ভিতর দিয়া উত্তপ্ত বায়ু চালাইয়া দেওয়া। ইহাতে একই সময়ে গুটীর ভিতরের পোকা বা পুত্তলী মরে এবং গুটীও বার ঘণ্টার মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। সময় ও ব্যয় ইহাতে সংক্ষেপ হয়। তাহার পর গুটীগুলিকে জড় করিয়া বস্তাবন্দী করিয়া সূতাকাটার জন্য মজুত করা হয়। প্রত্যেক গুটীতে আট শত হইতে বার শত গজ খুব সূক্ষ্ম (১।১২০০ ইঞ্চি) সূতা পাওয়া যায়। এক ছটাক বীজে প্রায় ত্রিশ হাজার রেশম কীট পাওয়া যায়, এবং প্রায় দুই মণ গুটীতে পরিণত হয়; পরিশেষে ভালভাবে জড়ান ছয় সের সাড়ে ছয় সের রেশম সূতা তৈরী হয়। এ জন্য পলুদিগকে পুষিতে প্রায় পঁচিশ মণ তুঁতপাতা লাগে। ইহা হইতে বুঝা যায় তুঁতের বিস্তৃত আবাদ এই শিল্পের একটী প্রধান অঙ্গ।

কাটাই কারখানাগুলি গুটী ক্রয় করিয়া কাঁচা রেশম কাটাই করে। বুনন জাপানে তাঁতিদের গৃহশিল্প। অধিকাংশ তাঁতই এখন সেখানে বিজলীর (Electricity) সাহায্যে চালিত হইতেছে। অধিকাংশ তাঁতিই নিজ গৃহে দুইচারটী তাঁত চালায়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, শিল্পে এবং অনেক বিষয়ে কৃষির উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছে সস্তাদরে বিদ্যুৎ বা বিজলীর সরবরাহ। আমাদের দেশের নদীর তুলনায় জাপানের নদীগুলিকে খাল বলিলেই হয়। কিন্তু ইহাদের জলস্রোতের সাহায্যে বিজলী উৎপন্ন করিয়া দেশময় সস্তা দরে বিজলী সরবরাহ করা হইতেছে। পল্লীর কৃষকের গৃহ বিজলীর আলোকে আলোকিত, বিজলীর সাহায্যে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি চলিতেছে, ঘরে ঘরে তাঁত চলিতেছে, এমন কি টিনের কারিগর ঝালাই করিতেছে। বিজলীর সাহায্যে অনেক স্থানে রেল চলিতেছে এবং অনেক গ্রাম ও মাঠের ভিতর দিয়া ট্রাম চলিতেছে। সকল শিল্পেই বিজলীর ব্যবহারে কম পরিশ্রমে এবং কম সময়ে অতএব কম খরচে জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে। জাপান যে সস্তা দরে জিনিষ বিক্রয় করে, বিজলীর সাহায্য হইল তাহার প্রধান উপায়। প্রথমে গভর্ণমেণ্টই সেখানে বিজলী উৎপন্ন করিবার পথ দেখাইয়াছে। তাহা ছাড়া সকল বিষয়ে গবেষণা এবং পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকায় সেখানে পাশ্চাত্য যন্ত্রপাতি, যেমন তাঁত, পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজন মত কাঠ লাগাইয়া এবং যতদূর সম্ভব সস্তা করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে লোকে সহজেই এই সকল কিনিতে ও ব্যবহার করিতে পারে। যে লৌহনির্ম্মিত তাঁতের মূল্য ইউরোপ আমেরিকায় হয় তো পনর শত টাকা, জাপানে যতদূর সম্ভব কাঠ দিয়া তৈরী সেইরূপ তাঁতের মূল্য হয় তো দুই শত টাকা। লৌহনির্ম্মিত তাঁতের মত ইহা টেঁকসই নয়; কিন্তু কাজ চলিয়া যাইতেছে এবং সকলেই ক্রয় করিতে পারে। এই জন্যই সেখানে অধিকাংশ তাঁতি নিজ গৃহে দুই চার ছয়টী তাঁত চালাইতে পারে।

তাঁতিদের সমিতি আছে। কিরূপ কাপড় বুনিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সেই সমিতি সভ্যদিগকে উপদেশ দেয়, বুনা হইলে কাপড় একত্র করিয়া দেখে ঠিকমত মোটা সূতায়, টানা পোড়েনে ঠিক সংখ্যক সূতায় এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ঠিক বুনা হইয়াছে কিনা। তারপর কাপড় ধোলাই ও ইস্ত্রি করা হয়। পরে গভর্ণমেণ্টের পরীক্ষাগারে পাঠান হয়, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ছাপ দিলে চালান দেওয়া হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের সমতা সাধন জন্য (Standardisation) এইরূপ করা দরকার। কোন জিনিষ পছন্দ হইলে ক্রেতা পুনরায় যখন সেই জিনিষ ক্রয় করিতে যায় তখন যদি সেই জিনিষটী পায় তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চারু বাবু তাঁহার 'জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "আমি নানা দেশে ভারতীয় ব্যবসাদারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহারা ভারতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র আমদানী ও বিক্রয় করে না কেন। উত্তরে সকলেই বলিয়াছে যে, এখন ভারতে প্রস্তুত রেশমী বস্ত্র একই নামের একখানি কাপড় আর এক খানির সমান নয় এবং অসমান কাপড় বিক্রয় হয় না। ভারতের তন্তুবায়েরা শিল্পনৈপুণ্যে কম নয়; কিন্তু হাতে কাজ করিয়া বিজলীর সমকক্ষতা করিতে পারে না। উন্নত প্রণালী, উন্নত যন্ত্র এবং বিজলীর সাহায্য পাইলে আর বিদেশী বাজারের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চাহিদা বুঝিয়া জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারিলে তাহারা পৃথিবীর সকল তন্তুবায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে সমর্থ। এই সকলের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন।" এই সব করিয়া জাপান এখন সমগ্র জগতের বাজারের শতকরা ৮০ ভাগ রেশম সরবরাহ করে, পনর ভাগ করে চীন, আড়াই ভাগ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, এক ভাগের কিছু বেশী করে তুর্কী প্রভৃতি দেশ, আর এক ভাগেরও কম হয় ভারত হইতে।

জাপানে কত লোকের যে ইহাতে অন্নসংস্থান হইতেছে এবং এই শিল্পের কিরূপ বিশালতা লাভ হইয়াছে তাহা চারুবাবুর পুস্তকের উদ্ধৃত কয়েকটী অংশ হইতেই বুঝা যাইবে।

"প্রায় দুই লক্ষ কৃষক তুঁতের কলম উৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে এবং ইহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ বৎসরে সাতচল্লিশ লক্ষ ইয়েন (ইয়েন আমাদের টাকার প্রায় সমান, কিছু বেশী হইবে)।···প্রায় আট হাজার লোককে ডিম উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকে অবস্থাপন্ন এবং পনের কুড়ি হইতে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক নিযুক্ত করিয়া তুঁত চাষ করে এবং পলু পুষিয়া ডিম বিক্রয় করে। প্রত্যেকবার ডিম উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট গবেষণা কেন্দ্র হইতে ইহাদিগকে ডিম দেওয়া হয়। আবার ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন চোগড়া চোগড়ী ও ডিম পরীক্ষা করিয়া তবে ডিম বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। এই পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের তিন শত তেতাল্লিশটী কেন্দ্র আছে এবং আট শত তেত্রিশ জন বিশেষজ্ঞ এবং দুই শত চৌত্রিশ জন কেরাণী নিযুক্ত আছে এবং প্রায় সত্তর হাজার বালিকা অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতি বৎসর পাচ ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত হয়।" যে ডিম পাশ হইয়াছে, পলুপালনকারীরা তাহা ক্রয় করিয়া পলু পালন করে। প্রায় চল্লিশ হাজার লোকের মারফতে দেশময় ডিম বিক্রয় হয়। ইহারা হইল ডিম বিক্রয়ের দালাল। পলুপালনকারী গৃহস্থের সংখ্যা প্রায় বাইশ লক্ষ ষোল হাজারের উপর। গুটী হইলেই বিক্রয় করিয়া দেয়। গুটী বিক্রয় করিয়া গড়ে প্রত্যেক গৃহস্থ আড়াই শত ইয়েনের উপর পায় এবং গড়ে প্রত্যেকের তুঁতের জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। ১৯২৯ খৃঃ অঃ উৎপন্ন গুটীর মূল্য হইয়াছিল ৬৫,৫০০১০০০ ইয়েন (প্রায় সত্তর কোটী টাকা)। গুটী বিক্রয়ের দালালী করিয়া ১০৫০০০ লোক জীবিকা অর্জ্জন করে। পলুপালকদের সমিতি আছে। সমিতির উদ্দেশ্য হইতেছে উন্নত উপায়ে তুঁত চাষ করা, পলু পালন করা এবং উত্তম গুটী উৎপাদন করা। অনেক গ্রাম্য সমিতি বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছে। জাপানে উৎপন্ন রেশম বস্ত্রের মূল্য এখন প্রায় পঞ্চান্ন কোটী ইয়েন এবং প্রায় পনর কোটী ইয়েনের রেশম বস্ত্র বিদেশে চালান হয়। তাহা ছাড়া

পাকাই, রাঙান, ধোলাই কারখানাতে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ে বহু লক্ষ লোক জীবিকা উপার্জ্জন করে।”

“জাপানের এই উন্নতি অতি অল্প দিন মধ্যেই ঘটিয়াছে। ১৮৬০—৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশ হইতে দেড় কোটী টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম সূতা চালান দেওয়া হইত। তখন চীন ও জাপান হইতে কোন রেশম বাহিরে চালান দেওয়া হইত না। বাঙ্গালায় রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহার ফলে বাঙ্গালার রেশমের এখন বিদেশী বাজারে স্থান নাই বলিলেই চলে।” “জাপানে শুধু গবেষণা এবং ডিম পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর প্রায় এক কোটী দশ লক্ষ ইয়েন খরচ করে। পাকাই, রাঙাই, বুনন ইত্যাদির জন্য পৃথক গবেষণা কেন্দ্র আছে।”

এই সম্পর্কে বলা চলে, গত কয়েক বৎসর মধ্যে কৃত্রিম রেশম (রেয়ন) শিল্পেরও অভাবনীয় উন্নতি জাপানে হইয়াছে। কিন্তু এই নকল রেশম তৈরীর একটী কারখানা স্থাপন করিতে অনেক লক্ষ টাকার মূলধন দরকার হয় এবং এই বিষয়ে কোন শিক্ষা না থাকায় বৈদেশিক লোকের সাহায্য দরকার।* এই সব কারণে এইদিকে লক্ষ্য না দিয়া যাহাতে আসল রেশম শিল্পের, যাহা এই দেশে বহুকাল হইতে আছে, উন্নতি হয় তাহা দেখিতে হইবে। আর পলু পালন, গুটী বা কোয়া হইতে সূতা তৈরী প্রভৃতি অল্প পরিশ্রমের কাজ কৃষকের বাড়ীতে ছোট ছেলে মেয়েরা বা বৃদ্ধেরাও করিতে পারে, এ জন্য কৃষির সহিত উপশিল্প হিসাবে ইহার মূল্য অনেক।

---

* কৃত্রিম রেশম (Rayon) সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রীযুত পতিতপাবন পাল (এম, এস, সি; এ, এম, সিটি; এ, আই, সি;) সন ১৩৪১ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা “প্রবর্ত্তকে” যে মূল্যবানপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে ভারতে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মত অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য পাইলে অবশ্য এই শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আশা করি বৈদেশিক অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য দরকার হইবে না।

১৩৩৯ সালের কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসীতে" বিবিধ প্রসঙ্গে মালদহের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সিল্ক ইউনিয়ন দ্বারা এই ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম। "মালদহ সহরের নিকট পিয়াস-বাড়ীতে একটী গুটী পোকা লালনের স্থান ও সূতা কাটিবার ছোট কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে দরিদ্র কুটার শিল্পীরা অল্পায়াসে নিখুঁত ও সুন্দর পছন্দসই দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন তজ্জন্য মহীশূর গভর্ণ-মেণ্টের অনুকরণে কুটীর শিল্পীদের উপযোগী ছোট ছোট কল আনাইবার চেষ্টা হইতেছে।" বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার দ্বন্দ্ব বড় গ্রামবি হইতে যদি ২।১ জন শিক্ষার্থী সেখানে পাঠাইয়া ভাল করিয়া কাজ শিখাইয়া এখনই কাজ আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সুবিধা হয়। গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি থাকিলে এই সব কাজ করা সুবিধাজনক।

মৎস্য-সমস্যা

(১)

আমাদের তো সমস্যার অন্ত নাই। 'শিরে কৈলা সর্পাঘাত কোথা বাঁধিবি তাগা'। যেখান হইতে সকল সমস্যার সমাধান হইবে সেই রাজ-শক্তির (Government) উপর জাতির আত্মকর্ত্তৃত্ব না থাকায় সমস্যার অন্ধকার ক্রমশঃ নিবিড় ও জটিল হইতেছে। তবু ভাবিয়া দেখা দরকার, ইহারই মধ্যে যদি কিছু করা যায়। মৎস্য বাঙ্গালীর মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্য। শুনিয়াছি 'ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয়,' আর আলোচনায় যদি 'সিকি'ও হয় তবু তো কিছু লাভ; তাই আজ মৎস্যের কথা কিছু আলোচনা করিতেছি।

চিকিৎসা শাস্ত্রে যাঁহারা 'বিদ্' তাঁহারা বলেন যে, আমাদের দেহ গঠন ও রক্ষার পক্ষে খাদ্যের মধ্যে "প্রোটীন (protein) জাতীয় পদার্থই প্রধান ও একান্ত আবশ্যক। নিরামিষ মধ্যে ডালে বেশ প্রোটীন আছে, আর আমিষ সকলেই—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ সবেই বেশ প্রোটীন আছে এবং এইগুলিতে যে প্রোটীন আছে তাহা আমাদের শরীরে গ্রহণের পক্ষে বেশী উপযোগী। লিভারের (যকৃৎ) ক্রিয়া খুব ভাল না থাকিলে ডাল হজম করিয়া প্রোটীন যথাযথরূপে গ্রহণ করা যায় না। বাংলার জল বায়ু আর্দ্র, এখানে যকৃতের ক্রিয়া স্বভাবতঃই কিছু মন্দ, এজন্য বাঙ্গালী 'ড়হর কা ডাল' আর 'গঁহুকা রোটী' হইতে উপযুক্ত প্রোটীন লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া মৎস্যপ্রিয় হইয়াছে। বাংলায় প্রচুর নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, আছে। (আছে না বলিয়া ছিল বলাই ভাল ছিল কারণ অনেক নদী, পুকুর, বিল মজিয়া গিয়াছে) একদিন তাহা হইতে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত এবং এই পুষ্টিকর খাদ্যের প্রাচুর্য্য বাঙ্গালীকে শক্তি সামর্থ্য

যোগাইত। বাঙ্গালায় তখন রোগও কম ছিল এবং বাংলার কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহও খুব ছিল।

এক হিসাবে মৎস্য মাংস অপেক্ষাও উত্তম খাদ্য। কারণ ইহার প্রোটিন মাংস অপেক্ষাও সহজপাচ্য এবং খাদ্যের অন্যান্য গুণ হিসাবেও ইহা মাংসের সমকক্ষ। তাহা ছাড়া ইহাতে গ্রহণোপযোগী ফস্‌ফেট (মেধাবর্দ্ধক অপর একটী পুষ্টিকর পদার্থ) মাংস অপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের বিভিন্ন আস্বাদ থাকায় মুখ বদলাইবার সুবিধা; এবং নিজ নিজ রুচি অনুসারে নানারূপ মৎস্যের মধ্যে বাছিয়া খাওয়া চলে; তাহাতে হজম ভাল ও শীঘ্র হয়। অবশ্য এই ভীষণ দারিদ্র্যের দিনে বোধ হয় অনেকের পক্ষে মনে হয় হজম যত দেরীতে হয় ততই ভাল।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে ভালভাবে শরীর বজায় রাখিতে গেলে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে অন্ততঃ প্রত্যেকের দৈনিক একপোয়া করিয়া মাছ খাওয়া দরকার। মাঝে মাঝে দুই একদিন ভোজ বাড়ীতে কি ঘটে না ঘটে, তাহা বাদ দিলে কি সহর কি পল্লীতে কয়জনের ভাগ্যে আজকাল তাহা জুটে? আজকাল মৎস্যের মহার্ঘতা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অবনতির একটী প্রধান কারণ। প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া শরীর বেশ তাজা রাখিতে পারিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণও কম হয় এবং তাহা ছাড়া কই, ট্যাঙরা, ল্যাটা, শোল, ভ্যাদা প্রভৃতি মৎস্য পুকুরে ও বিলে প্রচুর থাকিলে অনেক ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশার ডিম, বাচ্চা খাইয়া আর একদিকে স্বাস্থ্যের সাহায্য করে। অর্থসম্পদ হিসাবেও মৎস্য দেশের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়।

এখন এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া খুব দরকার, কি করিয়া দেশের এই প্রয়োজনীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষিত হইতে পারে। বিভিন্ন প্রকার মৎস্যের জীবনযাপন প্রণালী, প্রকৃতি, আহার, ডিম পাড়িবার কাল প্রভৃতি তথ্য যাহাতে অনেকে জানিতে পারে এইরূপ পুস্তিকা প্রকাশ এবং ম্যাজিক লণ্ঠন

বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা। ইহা এক ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা গভর্ণমেণ্ট দ্বারাই সম্ভব। ডিম পাড়িবার সময় সেই সেই মৎস্য বেশী ধরা যাহাতে বন্ধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা। যে সব পুকুর মজিয়া গিয়াছে বা জলজ উদ্ভিদ পানা, শ্যাওলাতে একেবারে বোঝাই হইয়া মৎস্য-বাসের অযোগ্য হইয়াছে সেগুলি সমবায় নীতিতে সংস্কৃত হইয়া যাহাতে অনেকেই তাহাতে মৎস্য চাষের জন্য উৎসাহিত হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। অনেক বিলের নদীর সহিত সংযোগের মুখ বা খাল লোকে বন্ধ করায় বা বুঁজিয়া যাওয়ায় নদীর জলের যোগ নষ্ট হওয়ায় মৎস্যের পক্ষেও যেমন ক্ষতি হইতেছে আবার বৎসর বৎসর নদীর নূতন জল আসিয়া বদ্ধ জলের অস্বাস্থ্যও তেমনি দূর হইতেছে না। নদীর জলের সহিত নূতন পলিমাটী আসিয়া দেশকে যে অধিক উর্ব্বরা করিবে তাহার পথও ক্রমশঃ রুদ্ধ হইতেছে। জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির এ বিষয়ে আশু মনোযোগী হওয়া দরকার।

অনেক জায়গায় এখনও প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালান দেওয়া ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত না থাকায় কত যে সম্পদ বৃথা অপচিত হইতেছে তাহা বলা যায় না। এই সব স্থানের প্রচুর মৎস্য, হয় যেমন তেমন ভাবে রোদে শুকাইয়া 'শুট্‌কী মাছ' তৈরী করিয়া আসামের নাগা, লুসাই প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বা চট্টগ্রামবাসীগণের জন্য চালান দেওয়া হয় (কারণ তাহা একরূপ অখাদ্য এবং পুষ্টিকর হিসাবেও নিকৃষ্ট) অথবা বরফ দিয়া খুব করিয়া ঢাকিয়া রেলে দূরস্থ সহরে বাবুদের উৎকট মৎস্য পিপাসা মিটাইতে পাঠান হয়—অবশ্য কতকটা 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে' বই কি। চারিদিকে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইলে কি হয়, আমরা এক বরফ দিয়ে সংরক্ষিত করিয়া পাঠান ছাড়া আর ভাল উপায় কিছু জানি না (কি করিয়া জানিব, কেরাণী তৈরীর বেশী বিদ্যাশিক্ষা তো বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী বড় দেয় না।) এই বরফ দিয়ে মৎস্য পাঠান সম্বন্ধে ইউনাইটেড ষ্টেটস অব্ আমেরিকার Fish Commission ১৮৯৯ সালে লিখিয়াছেন—It is well-known that ice as ordinarily used in

packing is more or less unsatisfactory. It spoils the freshness, flavour and firmness of the fish, moreover, the moisture of the melting ice favours the development of putrefactive bacteria and thus hastens decay, which is only the result of activity of certain putrefactive bacteria. অর্থাৎ বরফে মাছের স্বাদ, টাটকা ভাব, এবং ভিতরের "আঁট" নষ্ট করে, তাহা ছাড়া বরফজাত আর্দ্রতা পচনশীল জীবাণুর অনুকূল বলিয়া শীঘ্র মৎস্যের বৈলক্ষণ্য ঘটায়।

আর একজন বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে লিখেছেন—Fish is most dangerous in the initial stage of decomposition which is often masked by the ice, resulting in number of ptomain poisoning. Such cases are not infrequent in Calcutta. Besides actual poisoning, it produces lots of ill-health which is not reported to the authorities.

অর্থাৎ মাছের যখন পচনক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন তাহা খাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক; আর এই অবস্থা (প্রথম পচনের অবস্থা) বরফ দেওয়ার জন্য জানিতে না পারায় অনেক খাদ্য-বিষ-ঘটিত মৃত্যু হয় এবং কলিকাতায় তাহা বিরল নয়। তাহা ছাড়া অল্প স্বল্প পেটের অসুখ এজন্য অনেক ঘটে যাহার কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ড তাহার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও ব্যবস্থার ফলে সমুদ্র পারের দূর দেশ দেশান্তর হইতে মৎস্য মাংস ডিম যথাসম্ভব ভাল ভাবে আনিয়া জাতীয় কল্যাণ করিতেছে; আর আমাদের ঘরের কাছে দুই একদিনের রাস্তায় পাঠাইতেও এত গলদ! এমন কি Cold Storage Vansএ in fast trainsএ পাঠানর ব্যবস্থাও রেলওয়ে বোর্ড বা গভর্ণমেণ্ট দ্বারা হয় না। সমুদ্রে আমাদের খাদ্যোপযোগী কয়েক প্রকার মৎস্যও প্রচুর

মেলে ; বঙ্গোপসাগরও বেশী দূর নয়। কিন্তু আমাদের 'সাগর কূলে বসিয়া বিরলে হেরিব লহরী মালা' ছাড়া আর কোন পথ তো বর্ত্তমান অবস্থায় দেখি না। বড় জোর বেশী গোলমাল করিলে দুই একটা ফিসারী কমিশন বসিবে ; পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকা মাহিয়ানার মোটা মোটা সাহেব বিলাত থেকে আসিবে, যত দিন দশ বিশ লাখ খরচ না হয় special train যাতায়াত এবং লেখা লেখি চলিবে, দেশের মোড়লরা ঘাড় নাড়িবে। বাংলার যুবক, তুমিও কি ইহাতে ভুলিবে ?

(২)

ভাতের পরে মাছই বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। এই সম্বন্ধে এখনও যথোচিত আলোচনা হয় নাই এবং ইতঃপূর্ব্বে যে সব আলোচনা ও তথ্য বাহির হইয়াছে তাহাও কাজে লাগানর ব্যবস্থা হইতেছে না। ১৯০৭ খৃঃ অঃ স্যার কে, জি, গুপ্ত আই, সি, এস, মৎস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া গভর্ণমেণ্টকে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা কতদূর কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে, দেশবাসীর সে খোঁজ লওয়া উচিত। এস্থলে উক্ত রিপোর্টের কতক অংশ (১১১—১১৯ প্যারাগ্রাফ) উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

১১১। রেলের প্রসার হওয়ায় মৎস্যের অবাধ বিতরণের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু মৎস্য সহজে পচনশীল এবং এতদ্দেশে শীত মৃদু এবং অল্প দিন স্থায়ী। শীতল সঞ্চয়াগার ও রেফ্রিজারেটারের (refrigerators) ব্যবহার কার্য্যতঃ অজ্ঞাত। কেবল ২।৪টী বড় সহরে বরফ পাওয়া যায় এবং তাহার মূল্যও এত অধিক যে তাহা ব্যবহার করিলে চালানের খরচা অনেক বাড়িয়া যায়। গ্রেট বৃটেনের প্রধান প্রধান মৎস্য ধরার কেন্দ্রে নামমাত্র দরে বরফ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, অ্যাবার্ডিন (Aberdeen) সহরে বরফের দাম টন প্রতি ৮ শিলিং ১ পেনি অর্থাৎ মণপ্রতি ৶১০। এরূপ দর

হইলে মাছ প্যাক করিতে বরফ অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে।

১১৩। সুন্দরবনের মৎস্যক্ষেত্রসমূহে যে অধিক কার্য্য হয় না তাহার অন্যতম কারণ এই যে, সত্বর চালানের উপায় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত উক্ত মৎস্যক্ষেত্রসমূহ হইতে মৎস্য সংগ্রহ করার জন্য শীতল সঞ্চয়াগারযুক্ত লঞ্চ (Launches) নিযুক্ত না হয় ততদিন সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যাইতে পারে না।

১১৪। উড়িষ্যার মোহানাসমূহ ও চিল্‌কাহ্রদে শীতকালে মৎস্য ধরা হইলেও উপযুক্তরূপে বাজারে টাটকা অবস্থায় পাঠাইবার কোন উপায় না থাকায় মৎস্যগুলিকে লবণ প্রয়োগ করিয়া শুষ্ক করিতে হয়। ধামড়া মোহানা উৎকৃষ্ট মৎস্যক্ষেত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। ইহা কলিকাতা হইতে চাঁদবালী যাওয়ার রাস্তায় অবস্থিত। যে কয় মাস উক্তস্থানে মৎস্য ধরার কার্য্য হয় সেই কয়মাস শীতল সঞ্চয়াগারযুক্ত ষ্টীমারে (Steamer Service) কলিকাতায় টাটকা মৎস্য চালান দেওয়া শক্ত নহে। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চিল্‌কাহ্রদ হইতে কলিকাতায় নিয়মিতরূপে টাটকা মাছ চালান দেওয়া সহজ। মোটর বোটের সাহায্যে হ্রদের অপর প্রান্ত হইতে মাছ আনিয়া বরফদ্বারা প্যাক করিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলের বালুগ্রাম ষ্টেশন হইতে কলিকাতায় পাঠাইতে পারা যায়। চণ্ডীপুর বালেশ্বর হইতে কেবল ৮ মাইল দূর এবং রাস্তাও ভাল। এতদ্ভিন্ন চণ্ডীপুর একটী রেলষ্টেশন, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যবহার হয় না।

১১৫। উত্তর বিহারে চালানের অসুবিধার জন্য কতকগুলি মূল্যবান মৎস্যক্ষেত্রে উত্তমরূপে কার্য্য হয় না। মুঙ্গের জেলার বেগুসরাই হইতে ১৭।১৮ মাইল দূরস্থিত কবরতাল নামক প্রকাণ্ড ঝিল ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাতে যথেষ্ট মাছ আছে এবং উহা ২।৩ পয়সা সেরে ঐ স্থানে বিক্রয় হইয়া থাকে।

১১৭। * * * * কিন্তু যেরূপভাবে জলভাগ কমিয়া যাইতেছে এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে আর শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। সর্ব্বত্র মাছের অভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, মূল্য অধিক হওয়ায় এবং পোনা ও অল্পবয়স্ক মাছ যথেচ্ছভাবে বিনষ্ট হওয়ায় প্রাকৃতিক উৎপাদন আরও কমিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে যত্ন ও পরিশ্রম করিলে এবং কৃত্রিম উপায়ে বংশবৃদ্ধি করিলে বঙ্গদেশের স্থলান্তর্গত (পুকুর, বিল, ঝিল, খাল প্রভৃতির) মৎস্যক্ষেত্রসমূহের এতদূর পরিপুষ্টি হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা সমস্ত দেশের অভাব পূরণ করিয়াও রপ্তানীর জন্য যথেষ্ট মাছ থাকিতে পারে। * * * * বঙ্গদেশ অপেক্ষা যে সকল দেশ মৎস্য চাষের পক্ষে অল্পতর অনুকূল অবস্থাযুক্ত সে সকল দেশেও মৎস্য চাষে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। এখন আবশ্যক কেবল আধুনিক প্রণালীসমূহ অধ্যয়ন ও উপযুক্ত উপায়ে উহাদের এতদ্দেশে প্রবর্ত্তন।

১১৯। (১) নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ও প্রণালী প্রবর্ত্তন ও পরিচিত করণ :—

(ক) উপযুক্ত এবং সম্যকরূপে সজ্জিত নৌকাসমূহ ;

(খ) মৎস্য ধৃত করণের এবং জীবিত অবস্থায় অথবা শীতল সঞ্চয়াগার দ্বারা মৎস্য চালানের উন্নত এবং অভিনব প্রথাসমূহ ;

(গ) জল অথবা স্থলপথে শীঘ্র শীঘ্র বহন ;

(ঘ) টিনে করিয়া কিংবা অন্য উপায়ে মৎস্য সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় ;

(ঙ) মৎস্যোৎপন্ন দ্রব্যাদি যথা আইসিংগ্লাস (Isinglass) আঁইস, তৈল ডিম প্রভৃতির সদ্ব্যবহার ;

(২) ধীবরগণকে শিক্ষা প্রদান ;

(৩) মৎস্যক্ষেত্রের পরিপুষ্টি ও কার্য্য করার জন্য মূলধন প্রয়োগে ও ব্যবসায়ে উৎসাহ দান ;

(৪) এই বিষয়ে যাবতীয় আবশ্যক সংবাদ প্রচার ;

(৫) জলচর জীব সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালনা ;

(৬) দেশীয় ও বিদেশীয় উপযুক্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিয়োগ ; ও সর্ব্বশেষে

(৭) মৎস্য ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক উভয়দিকেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাগার স্থাপন।

মৎস্য-সমস্যা সম্বন্ধে ডক্টর যামিনীরঞ্জন মজুমদার তাঁহার "মৎস্য-বিজ্ঞান" পুস্তিকায় (দি গ্লোব নার্শরী হইতে প্রকাশিত ; অনেক মূল্যবান কথা লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উহা হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"………মৎস্যকুলের রক্ষণাবেক্ষণ আইনের সাহায্যে অনেক সময় আবশ্যক হইয়া পড়ে। অপরাপর দেশে আইনদ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয়—(১) নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট জাতীয় মৎস্য ধরা বন্ধ করা (২) পোনা ধরা অথবা বিক্রয় করা নিষেধ (৩) মাছের যাতায়াতের পথ না রাখিয়া খাল বিল প্রভৃতিতে বাঁধ দেওয়া বন্ধ করা (৪) নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রযুক্ত জাল প্রভৃতি মৎস্যধরার যন্ত্র ব্যবহার ও (৫) জলাশয়ে ডিনসাইট কিংবা কোন বিষাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করা নিষেধ। এই সমস্ত ধারার মধ্যে ৫মটী আমাদের প্রচলিত আছে। ১ম ও ৪র্থ প্রবর্ত্তন করা অসম্ভব, সুতরাং ২য় ও ৩য়টী চালান একান্ত আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ মৎস্যের বংশবৃদ্ধি—এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায় :—(১) পোনা ধরিয়া বড় না হওয়া পর্য্যন্ত চৌবাচ্চায় প্রতিপালন (২) বস্ত্রের দ্বারা নদীবক্ষে ভাসমান ডিম্ব ধরিয়া পুকুরে ফোটান এবং যখন পোনা হইয়া বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দল বাঁধিয়া বিচরণ করে, তখন তাহাদিগকে বিভিন্ন পুকুরে প্রতিপালন (৩) জাপানী

ও ইউরোপীয় প্রথায় রোহিত জাতীয় মৎস্য প্রতিপালন (উক্ত প্রথা নিরূপণ)। কতকগুলি সন্তানোৎপাদনকারী পরিপুষ্ট মৎস্য সংগ্রহ করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন পুকুরে রাখ; ডিম্ব প্রসবের সময় উহাদিগকে তুলিয়া একটী পুকুরে ছাড়িয়া দেও, উক্ত পুকুরে ভাসমান জলজ উদ্ভিদ থাকা আবশ্যক। এই সমস্ত উদ্ভিদেই ডিম্ব সংরক্ষিত হইয়া পোনা উৎপাদন করে। এই সকল ধাড়ি মৎস্য অনেক বৎসর ক্রমান্বয়ে সন্তানোৎপাদন করিতে পারিবে এবং উক্ত মৎস্যসমূহের দ্বারা স্বল্পব্যয়ে অনেক পোনা পাওয়া যাইবে। ছোট পোনা কিংবা ১।২ ইঞ্চি পরিমিত পোনা আর্দ্র শৈবালে বিচালীতে কিংবা ছোট ছোট টবে সহজেই অনেকদূর লইয়া যাওয়া যায়। (৪) কৃত্রিম পোনা উৎপাদনাগারে পোনা উৎপাদন :— ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রতিবৎসর এ সমস্ত উৎপাদনাগার হইতে বহু সংখ্যক পোনা বিতরিত হয়, এবং আমেরিকার যে সমস্ত নদীতে প্রায় মৎস্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, সে সকলও এই কৃত্রিম পোনা উৎপাদনাগারের সাহায্যে আজকাল অপর্য্যাপ্ত মৎস্যশালী হইয়া পড়িয়াছে।

* * * * খাদ্য ভিন্ন অপর হিসাবেও মৎস্য অত্যন্ত মূল্যবান দ্রব্য। মৎস্য হইতে শিরিষ, শুষ্ক ডানা, চর্ম্ম, তৈল, চাবুক, সার—এ সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কয়েকজাতীয় আড়, উড়িষ্যার তপসী জাতীয় নাকোরা নামক মৎস্য ও সল ভেটকীর পটকায় যথেষ্ট পরিমাণে শিরিষ প্রস্তুত হইতে পারে। হাঙ্গরের ডানা চীনদেশে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয় এবং বোম্বাই ও করাচী হইতে উক্ত দ্রব্য রপ্তানি হয়। বঙ্গ দেশে এই ব্যবসায় অনায়াসেই চলিতে পারে। শঙ্কর মৎস্যের ও কুম্ভীরের চর্ম্মের বাজারে যথেষ্ট কাটতি আছে। কিন্তু উহা প্রস্তুত করিবার প্রবৃত্তি বড় একটা দেখা যায় না। কেরাসিন তৈল প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে অনেক স্থানে মৎস্যজ তৈল প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এখনও শুশুক ও শঙ্কর মাছের তৈল জ্বালাইবার জন্য ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক জাতীয় শঙ্কর মৎস্যের পুচ্ছ চাবুক হিসাবে যথেষ্ট

সমাদৃত হয়। সর্ব্বশেষে মৎস্যজ সার। বঙ্গদেশে, দ্বারবঙ্গ ও মজঃফরপুর জেলায় ফলবৃক্ষে যথা—আম্র, লিচু, আঙ্গুর ও লেবু গাছে সার দিবার জন্য ও সাহাবাদ জেলায় সাধারণ উদ্যানে সার দিবার জন্য মৎস্য সার ব্যবহৃত হয়। ১৯০৭-৮ সালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল হইতে ১৫০০০ টন মৎস্য সার রপ্তানি হয় ও মালাবার উপকূল হইতে ১৭৫০০০ গ্যালন মৎস্য তৈল রপ্তানি হয়। সার রপ্তানি হওয়া যে দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর তাহা অনেকেই অবগত আছেন। জাপানীরা বৎসরে অন্ততঃ ১৫০০০ টন মৎস্য সার ব্যবহার করে; আর আমাদের মৎস্যজ ও অন্যান্য সার রপ্তানি হয়। ইহা অপেক্ষা আর কষ্টকর বিষয় কি হইতে পারে? আমরা সময় থাকিতে যদি মৎস্য চাষ ও ব্যবসায়ের ব্যবস্থা না করিতে পারি তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই যে আমাদিগকে একটী প্রধান খাদ্য ও সার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।”

দুগ্ধ সমস্যা

সন্দেশ রসগোল্লা লুচি মোণ্ডা দই ছানা ক্ষীর সর নবনী এই সব দেববাঞ্ছিত পরম খাদ্যের মূলে যে আছে গরু, তাহা আজ আবার আমাদের ভাল করিয়া স্মরণ করিবার দরকার হইয়াছে। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে গোমাতার দুগ্ধ পান করিয়া আমরা বর্দ্ধিত হইয়াছি, আজও যাহা আমাদিগকে নিত্য স্বাস্থ্য বল ও মেধা সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে, ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও রোগে যাহার জোরে আমরা জীবনের আলো আবার ফিরিয়া পাই, সেই গোমাতার দিকে আজ আমরা উদাসীন। সুস্থ সবল ও জীবনের আনন্দে ভরপুর হইয়া বাঁচিতে হইলে আমাদের আবার গড়িয়া তুলিতে হইবে সুঠাম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গো সম্পদ।

শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "খাদ্য সমস্যায়" (মাসিক বসুমতী) আমাদের অবস্থা খুব ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন * * * * "আমি নিজে পল্লীগ্রামে ১৮৲ মন খাঁটী গব্য ঘৃত বিক্রীত হইতে দেখিয়াছি, আর এখনকার ঘৃতের দাম চতুর্গুণ বা পাঁচগুণ হইলেও তাহার ভিতর যে কি থাকে, তাহা রাসায়নিক আমি, আমার অজ্ঞাত নাই। যত প্রকার "হারাম পদার্থ" কল্পনায় আনা যাইতে পারে, অর্থাৎ গরু শূকর মহিষ সাপ প্রভৃতির চর্ব্বি সকলই একাধারে ঘৃতের মধ্যে বিরাজ করে। কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে যে সকল মৃত গরু শূকর মহিষ ঘোড়া প্রভৃতি প্রত্যহ মিলে, তাহার জন্য প্রতি বৎসর ডাক উঠে। ধাপার মাঠে সেই সকল জন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কাটিয়া এক বৃহৎ কটাহে উত্তপ্ত করা হয়; উত্তাপের ফলে চর্ব্বি বাহির হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। দুই চারিটী সরল প্রক্রিয়ার পর এই চর্ব্বির রং ও গন্ধ সম্পূর্ণ দূর হয়; তখন মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীদিগের মারফৎ টীনে করিয়া এই বস্তু দ্বারভাঙ্গা

পাটনা প্রভৃতি স্থানে চালান দেওয়া হয়। আমাদের মাড়ওয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের গোমাতার প্রতি অচলা ভক্তি, পিঞ্জরাপোল স্থাপনের জন্য অসম্ভব উৎসাহ, কিন্তু ইঁহাদের কৃপায় এই চর্ব্বি ঘৃতের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পুনরায় বাংলা দেশে ফিরিয়া আসে, মূল্যের তারতম্য অনুসারে শতকরা পঁচিশ ভাগ হইতে পচানব্বই ভাগ পর্য্যন্ত এই বস্তু ঘৃতের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার পরে বর্ত্তমানে আর এক বিষম উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে,—"ভেজিটেবল-ঘি" (নিরামিষ ঘৃত) নামে এক পদার্থ বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। উদ্ভিজ্জ তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেন সম্মিলিত করাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়; রাসায়নিক হিসাবে দেখিতে গেলে ভাল চর্ব্বি ও ঘৃতের বড় একটা পার্থক্য নাই; কিন্তু এই নকল ঘৃতে ভাইটামিন নামক শরীর গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান একেবারেই নাই। এই কারণে এই সকল ঘৃতের ব্যবহার কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। ঘৃতের এই অপ্রাচুর্য্য ও দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ গোজাতির অবনতি।"

"সত্তর পচাত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাংলার পল্লীজীবনে গো-সেবা একটী নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য ছিল। * * * * গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য অবহেলার ফলেই পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত আজ দুগ্ধের দুর্ভিক্ষ। রেল ষ্টীমারের কাছাকাছি পল্লীতে এখন টাকায় দুইসের হইতে আড়াই সেরের অধিক দুগ্ধ পাওয়া যায় না। আর সুদূর পল্লীতে (যেখান হইতে দুধ সহসা রপ্তানী হয় না) হয়ত কালে ভদ্রে টাকায় আট সের দুধ মিলে, তাহাও আবার পরিমাণে যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থকে পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে নাস্তানাবুদ হইতে হয়। আমাকে গত আট বৎসরের মধ্যে কার্য্যোপলক্ষে দুইবার (১৯২০ ও ১৯২৬) বিলাত যাইতে হয়; দুই বারই আমি বিলাতের দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের সরবরাহের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা করি। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমি লণ্ডনে উপস্থিত ছিলাম। বিলাতে সেবার প্রচণ্ড শীত পড়িয়াছিল, রাস্তাঘাট বরফের সাদা আস্তরণে ঢাকা পড়িত;

সাধ্য কি কেহ সকাল সাড়ে আটটা নয়টার আগে শয্যা ত্যাগ করে। কিন্তু প্রকৃতির এই নির্ম্মম খেয়ালের মধ্যেও দেখিতাম যে, ভোরের আলো ফুটিবার আগেই দরজার গোড়ায় দুধের বোতল হাজির রহিয়াছে। দস্যু তস্কর কেহই এই বোতল স্পর্শ করিবে না, যথাসময়ে গৃহস্বামী বাহির হইয়া বোতল ভিতরে লইবেন। লণ্ডন অতি বিশাল নগরী, সত্তর লক্ষ লোকের বাস। লণ্ডনে পল্লী উপকণ্ঠ হইতে শেষ রাত্রে রেলযোগে সহরগুলির ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনে এই সত্তর লক্ষ লোকের উপযুক্ত দুধ জীবাণুশূন্য পাত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত হইয়া হাজির হয়, সেখান হইতেই মোটরযান ঠেলাগাড়ী প্রভৃতি বাহনে পাড়ায় পাড়ায় সরবরাহ করা হয়। তাহা ছাড়া পল্লীতে পল্লীতে দুই তিন রশি অন্তর গব্য পদার্থের দোকান (dairy), তাহাতে দুধ, মাখন, ডিম (ডিম সেখানে গব্য পদার্থের অন্তর্ভূক্ত) প্রচুর পরিমাণে মেলে। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানকার দুধ এখানকার অপেক্ষা অনেক সারবান হইলেও দামে সস্তা। হিসাব করিয়া দেখিয়াছি প্যারিসে দুধের দাম টাকায় আট সের, আর এই দুধ দেশের 'মাঠাতোলা' দুধ নহে।

"* * * ভারত গভর্ণমেণ্টের গো বিশেষজ্ঞ স্মিথ বলেন, "গরুর দরুণ ভারতবর্ষ বৎসরে ষাট কোটী টাকার অপচয় করে।" স্মিথের মতে লণ্ডনে দুধ ভারতবষ অপেক্ষা একশতগুণ সস্তা। টাকা হিসাবে লণ্ডন ও কলিকাতায় দুধের দাম প্রায় সমান, কিন্তু লণ্ডনের দুধ এদেশের দুধের অপেক্ষা অনেক গুণ সারবান এবং লণ্ডনবাসী কলিকাতাবাসী অপেক্ষা অন্যূন ত্রিশগুণ ধনী। * * * জন সাধারণের স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ দৈনিক আহার্য্যে দুগ্ধ ও গব্য পদার্থের অভাব।" (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন ১৩৩৫)।

অথচ শস্যশ্যামলা তৃণ বন শোভিতা এই দেশে ভালভাবে গো-পালনের সকল সুবিধাই বর্ত্তমান। জীবনকে হেলায় অবসাদ-খিন্ন করিয়া এমনভাবে নষ্ট করিবার দিন আর নাই। ধ্বংসের দেবতা ডম্বরু

বাজাইয়া অবসন্ন দুর্ব্বল কুৎসিতকে মুছিয়া ফেলিতেছেন। যাহারা শক্তিমান হইয়া উদ্যম সহকারে পরিপূর্ণ জীবন ভোগের সকল উপকরণ গড়িয়া তুলিবে এই দুনিয়া তাহাদেরই।

অর্থনীতির দিক দিয়া গরু শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অধিকাংশ গৃহস্থ তাঁহাদের বাড়ীতে দুই একটী গরু যত্ন সহকারে পালন করিতে পারেন,—বাড়ীর ফেন, তরকারীর খোসা প্রভৃতি অকারণে নষ্ট হইবে না এবং সংসারে দুধের সাহায্য হইলে তাহাতে অনেক সুবিধা। জাতীয় বেকার সমস্যার দিনে কয়েকজনে একত্রে সমবায় নীতিতে গোপালন ক্ষেত্র ও দুগ্ধ ব্যবসায় (Dairy farm) গড়িয়া সহরের উপকণ্ঠে সুন্দর ব্যবসার সৃষ্টি করিতে পারেন। আধুনিক প্রবন্ধ, বই এবং অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে গোপালন সম্বন্ধে তথ্যগুলি ভাল করিয়া শিখিয়া কার্য্যতঃ সেগুলি করিলে ক্রমে উন্নতি হইবে।

গরুর জন্য উপযুক্ত বাসগৃহ, খাদ্য ও প্রজননের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আলো ও বাতাসযুক্ত খোলা জায়গায় গরুর থাকিবার উপযোগী গোয়াল ও আওলাত করিতে হইবে। গোয়াল ঘর প্রশস্ত হওয়া চাই, যথেষ্ট আলো বাতাস আসা চাই এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। দিনে গরুর বিশ্রাম ও বিচালি মাখা খাওয়ার জন্য আওলাত বা উপরে আচ্ছাদিত অথচ চারিদিকে খোলা যায়গা রাখিতে হইবে। গোবর এবং আবর্জ্জনা গোয়াল হইতে দূরে লইয়া ফেলিতে হইবে। গোয়ালের ধারে ডোবা, জলা বা জঙ্গল যেন না থাকে, তাহাতে অত্যন্ত মশা হইয়া এবং আর্দ্রতায় গরুর স্বাস্থ্য খারাপ হয় এবং সেই মশা তাড়াইতে সন্ধ্যার সময় অতিরিক্ত ধূমা (সাঁজাল) করিতে হয়। গোয়াল ঘরের মেজেতে দুই-এক দিন অন্তরই কিছু শুকনা মাটী ও ছাই ছড়াইয়া দিতে হয়।

গরুর খাদ্য বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত দরকার। ভালরূপ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেড় গুণ দুই গুণ বেশী দুধ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য লোকে কথায় বলে "গরুর মুখে দুধ।" এক

ইঞ্চি আধ ইঞ্চি উঁচু ঘাসের মাঠে রোজ রোজ চরিয়া এবং শুক্‌না খড় নিত্য চিবাইয়া এদেশের গরু মানুষগুলিরই মত অনাহার-ক্লিষ্ট এবং হাড়-সর্ব্বস্ব ; দুধ যে কিছু পাওয়া যায় তাহা বোধ হয় আমাদের দুর্দ্দশায় নিতান্ত সহানুভূতির জন্য। মুখে শুধু গোমাতার জন্য দরদী না হইয়া যাহারা গরুর সত্যই যত্ন করিতে জানেন তাঁহারা গরুর জন্য কলাই, মটর, শালগম, গাজর এবং লুসার্ণ, গিনিগাস, জোয়ার, দেবধান প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু ও পুষ্টিকর ঘাস উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন করেন ; বিচালির সঙ্গে নিয়মিত খইল খাওয়াইয়া থাকেন। আমাদের অমনোযোগিতায় এবং বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের স্বার্থপরতায় এদেশের সরিষা প্রভৃতি তৈল বীজ অবাধে বিদেশে রপ্তানী হওয়ায় খইলের অভাবে গরুর এবং কৃষির ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ শীতকালে দুইবেলা বিচালির সঙ্গে গরুকে উপযুক্ত পরিমাণে খইল মাখিয়া দেওয়া একান্ত দরকার। কাঁটানটের গাছ বা লাউ ছোট করিয়া কলাই, ডালের 'খুদ' বা চাউলের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া লবণ সংযোগে খাওয়াইলে গরুর দুধ বিশেষ বাড়িয়া থাকে।

গরুকে গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ পরিষ্কার জলে স্নান করাইতে (ঝাপাইতে) হয়। সময় মত ভাল পানীয় জল খাওয়াইতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে ঘোলা বা কদর্য্য জল যেন পান না করে। এই সকল যথারীতি করিলে গরুর শ্রী ফিরিবে,—সুঠাম সুন্দর গঠন দেখিয়া যেমন চক্ষু জুড়াইবে তেমনি আবার কাঁড়ি কাঁড়ি দুধ স্বাস্থ্য সম্পদে আমাদিগকে শক্তিমান করিবে।

ভাল গরু এবং বেশী দুধ পাইতে হইলে প্রজননের জন্য সর্ব্বাগ্রে ভাল জাতীয় খুব বলিষ্ঠ ষাঁড়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ভাল ষাঁড় যেমন ভাবী গো-বংশের উন্নতির জন্য দরকার আবার তেমনই গরুর দুধ বাড়াইবার জন্যও বড় উচ্চ জাতীয় বলিষ্ঠ ষাঁড়ের সঙ্গে সম্মিলন করান দরকার। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর অল্প দুধের গরুকে যদি উচ্চজাতীয় বলিষ্ঠ ষাঁড় দ্বারা "পাল" দেওয়ান যায়, তাহা হইলে বাছুর হইবার পর গরুটীরও দুধ অনেক বাড়িয়া থাকে। ইহার ভিতর প্রকৃতির একটী

গূঢ় সত্য নিহিত আছে। উচ্চ জাতীয় বলিষ্ঠ বৎসটীর পোষণের জন্য বেশী দুধের দরকার সেইজন্য প্রকৃতি দেবী সেই গো-মাতাকেও বেশী দুগ্ধবতী করিয়া থাকেন। সকল দিক দিয়া দেখিলে ভাল জাতীয় বলিষ্ঠ ষাঁড় গো-প্রজননের জন্য একান্ত দরকার। তিন বৎসর হইতে আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ষাঁড় প্রজননের পক্ষে প্রকৃষ্ট। সবংশে বা সগোত্রে প্রজনন উন্নতির অন্তরায়; ভ্রাতাভগ্নী বা মাতাপুত্রের মধ্যে প্রজনন যেন কদাচ না ঘটে। পরীক্ষায় প্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে সকল দিকেই অবনতি ঘটে। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ একটী করিয়া তেজী ভাল জাতীয় ষাঁড় (মুলতানী কি ভাগলপুরী) রাখার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিংবা শুধু গভর্ণমেণ্টের চৌকীদারী ট্যাক্স আদায়কারী ও পাটের আবাদের রিপোর্টকারী বর্ত্তমান ইউনিয়ন বোর্ডের উপর নির্ভর না করিয়া গ্রামবাসীগণ সমবেতভাবে প্রত্যেক গ্রামের জন্য এই ব্যবস্থা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

দুধ যে পাত্রে দোহন করা হয় তাহা এবং দোহনকারীর হস্ত খুব ভাল ভাবে পরিষ্কার রাখা দরকার, কারণ দুধ অনেক রোগজীবাণুর পক্ষে অনুকূল বলিয়া শীঘ্রই জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হইতে পারে। আমাদের দেশে দুধের কেঁড়ে যে মাঝে মাঝে আগুনে শেঁকিয়া লইতে হয় তাহাও এই কারণে। আজকাল দুধকে জীবাণুশূন্য করিয়া ভাল ভাবে দোহন এবং অবিকৃত অবস্থায় বহু দূরে চালান দেওয়ার নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হইতেছে। আশা করি যাঁহারা এই কাজে লাগিবেন তাঁহারা সে সকল নিপুণভাবে শিখিবেন।

চিনির কথা

• এখনও ভারতকে যে সমস্ত বৈদেশিক জিনিষ আমদানী করিতে হয় তাহার মধ্যে কাপড় হইতেছে সব চেয়ে বেশী, তাহার নীচেই হইতেছে চিনি। চিনির উপাদান আখ, খেজুর গাছ ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, ভালই জন্মে, অথচ এই দারুণ আর্থিক দুর্দশার দিনেও বৎসরে প্রায় কুড়ি কোটি টাকার চিনি আমরা আমদানী করি। এই দিকে স্বাবলম্বী না হইতে পারিলে আমাদের অর্থসমস্যার সমাধান হইবে না।

চিনির বিষয়ে বাংলা দেশেরই বেশী করিয়া ভাবিবার বিষয় আছে। যে সব ভাল ভাল জাতীয় আখের চিনির মাত্রা (percentage) বেশী তাহার পক্ষে বাংলার মাটী বিশেষ উপযোগী। বাংলায় ধলী, কাজলা, শামসাড়া, বোম্বাই নটা প্রভৃতি যে সমস্ত আখ জন্মে তাহা বিহারের ২১০ নং কোইম্বাটুর (যাহা হইতে বিহারে এখন চিনির কারখানায় চিনি হইতেছে এবং যাহার চাস বিহারে বেশী হইতেছে) অপেক্ষা চিনির মাত্রা, রসের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ অথচ বাংলায় বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতির মত বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত চিনি তৈরীর উপযুক্ত বড় কারখানা মোটেই নাই। বাংলায় যে কয়েকটি আছে তাহা ছোট ছোট কারখানা, সাধারণতঃ centrifugal দ্বারা সেখানে গুড় হইতে চিনি তৈরী করা হয়। বিহারের প্রতাপপুরের (সারণ জেলা), Begg Sutherland Company-র চাম্পারণ sugar factory কিংবা সমস্তিপুর, বারহারওয়া (ছাপরা জেলা), বড়া চাকিয়া (Champaran), গৌরী বাজার (U. P) প্রভৃতি বড় বড় কারখানা যেখানে একেবারে আখের রস হইতে vacuum pan দ্বারা চিনি তৈরী হয় সেরূপ কারখানা বাংলায় নাই।

এখানে ভাবিবার কথা এই যে, চিনি তৈরীর কারবারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রধান একটী উপায় (factor) হইতেছে যে আখ হইতে বেশী মাত্রায় (percentage-এ) চিনি বাহির করা। ইহার সুবিধা বড় বড় বিজ্ঞানসম্মত কারখানায় বেশী। প্রধানতঃ এই জন্যই তাহাদের সাফল্য বেশী। প্রথমতঃ বাংলায় যেরূপভাবে তিন রোলারের আখমাড়াই কলে পিসিয়া রস বাহির করা হয় তাহাতে কতক রস থাকিয়া যায়, কিন্তু বড় বড় কারখানায় যেখানে আট, এগার, চৌদ্দ এমন কি সতর রোলারের মধ্য দিয়া আখ পিসিয়া যায় সেখানে সে রসটুকুও নিংড়াইয়া বাহির হয়। তারপর বাংলার চাষীরা যে ভাবে বেশী তাপে এবং খোলা কড়াইয়ে (open pan) গুড় তৈরী করে তাহাতে চিনির মাত্রা, যেখানে বড় কারখানায় vacuum pan-এ নিয়মিত কম তাপে রস হইতেই চিনি হয়, তাহার তুলনায় অনেক কম।

এর উপর বড় কারখানায় অনেক বেশী উৎপাদন একসঙ্গে স্বল্প সময়ে (large scale production) হয় বলিয়া খরচাও কম পড়ে। এজন্য চিনিতে সাফল্য লাভ করিতে হইলে বাংলায়ও বাঙ্গালীর দ্বারা বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত উপযুক্ত বড় চিনির কারখানা স্থানে স্থানে স্থাপিত হওয়া দরকার। যতদিন বর্ত্তমান চিনির উপর সংরক্ষণ শুল্ক বহাল থাকিবে, ততদিন হয়তো ছোট ছোট centrifugal চালিত কারখানাগুলি বৈদেশিক চিনির সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিন্তু বড় এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কারখানা না করিতে পারিলে এই ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে,—বিহার, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি—যেখানে বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে, তথায় সস্তায় চিনি উৎপন্ন হইলে বাংলার ছোট ছোট কারখানার স্থায়িত্ব কিসের উপর দাঁড়াইবে ?

যেমন কাপড়ের কলে বাংলা বোম্বাই, আমেদাবাদ অপেক্ষা পিছাইয়া আছে এবং এই কিছুদিন হইল প্রতীকারে মনোযোগী হইয়া বঙ্গলক্ষ্মী মিল,

মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী মিল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে এবং আরও কয়েকটি স্থাপনে যত্নবান হইয়াছে সেইরূপ চিনির কারখানাতেও বাংলা অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এখনও কিছু করিতে পারে নাই *। জাতীয় দুর্গতি দূর করিতে হইলে তাহাকে এই প্রয়োজনীয় শিল্পের প্রতি অবহেলা করিলে চলিবে না।

কি জন্য বাংলায় এতদিন বিহারের মত বড় চিনির কারখানা গড়িয়া উঠে নাই তাহার কারণ সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক এক বৎসর পাটের দর বৃদ্ধি হওয়ায় সেই মোহে পড়িয়া বাংলার কৃষক বেশী পরিমাণে আখ চাষ করিতে নারাজ হয়। আর পাটের ভাল ডাঙ্গা জমিগুলিই আখ চাষের পক্ষে বেশী উপযোগী। প্রধানতঃ এই কারণে Begg Sutherland Co. যখন এদেশে বড় চিনির কারখানা স্থাপন করেন বিহারেই তাহা করেন। অন্যতম কারণ বিহারে মজুরীর হারও কম। বড় বড় কারখানায় গুড় হইতে চিনি করা হয় না—একেবারে রাশি রাশি আখ আনিয়া এগার, চৌদ্দ কি সতর রোলারের মধ্যে পিসিয়া রসকে নিঃশেষে নিংড়াইয়া সেই রস হইতে চিনি করা হয়। তাহাতে চিনির মাত্রা percentage অনেক বেশী পাওয়া যায় এবং ইহা গুড় হইতে চিনি তৈরী করা বা গুড় করা অপেক্ষা অনেক সুলভ ও সুবিধাজনক। এ জন্য বড় কারখানার প্রথম সমস্যা হইতেছে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে আখ পাওয়ার ব্যবস্থা। বাংলার যেখানে এইরূপ কারখানা হইবে তাহার আশে পাশে চারিদিকে প্রচুর আখের চাষ না হইলে কারখানা চলিবে না।

এখন পাটের উৎপাদন যেরূপ অনিয়মিতভাবে অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে এবং বেশী উৎপাদন হইয়া দর অত্যন্ত কমিয়া দেশের দুর্দ্দশার চরম

* উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যে ২।৩টি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে (গোপালপুর, সিতাবগঞ্জ)। বাংলার কৃতী সন্তান ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম, বি, সম্প্রতি বসিরহাটের নিকট মৈত্রবাগানে যে নূতন চিনির কল স্থাপন করিতেছেন তাহা খাঁটী বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান।

হইতেছে তাহাতে অবিলম্বে পাটের চাষ কমাইয়া সীমাবদ্ধ করা বিশেষ দরকার। তাহা করিতে হইলে পাটের বদলে আখের চাষই সবচেয়ে সমীচীন। যদি অনেক আখ উৎপন্ন করিয়া উপযুক্ত দরে সেই আখই বিক্রয় করিবার সুবিধা ঘটে তবেই কৃষক ভরসা করিয়া সেইরূপ ভাবে আখের চাষ করিবে। আর চাষী যে ভাবে ছোট তিন রোলারের কলে পিসিয়া রস বাহির করিয়া খোলা কড়াইয়ে কড়া তাপে গুড় করে তাহাতে তাহার খরচা বেশী হয়, গুড়ের পড়তায় যে দাম সে পায় তাহা অপেক্ষা সরাসরি কারখানায় আখ বিক্রয় করিয়া বেশী দাম পাইবে আশা আছে। এই কারণেও বাংলায় স্থানে স্থানে বড় বড় চিনির কারখানা স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে চিনির কারখানা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী লোকও আছেন। বাঙ্গালী কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে এ সব কাজে টাকারও অভাব ঘটে না। বাঙ্গালীর মেধা ও অর্থ কি এদিকে খাটানর এখনও সময় আসে নাই ?

যাঁহারা আখের চিনির সম্বন্ধে ভাল বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে চান তাঁহারা "Cane Sugar and its Manufacture" by H. C. Prinsen Geerligs, Ph. D. (2nd revised edition) বইখানি পড়িয়া দেখিলে আনন্দ পাইবেন। "Cane Sugar" by N. Deerr বইখানিও বেশ ভাল। প্রত্যেক Factory-তে রাখিবার মত বই।

বাঙ্গালীর যক্ষ্মা সমস্যা

বাংলা দেশে আজ দশ বার বৎসর মধ্যে যক্ষ্মার প্রসার অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং ক্রমাগত বাড়িতেছে। ম্যালেরিয়ার মত যক্ষ্মাও আজ বাঙ্গালীর সম্মুখে বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরের তবু কুইনাইনের মত একটী উপযোগী ঔষধ বাহির হওয়ায় রোগ আয়ত্তে আনিবার উপায় আছে, কিন্তু এই রোগের সেইরূপ কোন উপযুক্ত ঔষধ এখনও বাহির না হওয়ায় ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে হতভাগ্য রোগীকে মৃত্যুর কবলে পড়িতে হয়। কোন পরিবারের যখন কেহ যক্ষ্মারোগে দীর্ঘকাল ভূগিয়া মারা যায়, তখন সেই পরিবারকে আর্থিক ও মানসিক যে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত পরিবারের উপর একটী বিষাদের করাল ছায়া দিনের পর দিন ঘেরিয়া থাকে। নানারূপ চিকিৎসায় হতাশ ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন যখন ঋণ করিয়া সেই জীবন্মৃতকে বায়ু পরিবর্ত্তনের (change) জন্য মিহিজাম, মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর, পুরী প্রভৃতি ঘুরাইয়া হয়রাণ হইয়া শেষে একদিন তাহাকে চিতায় বিসর্জ্জন দিয়া ফিরেন তখন জীবনে যে আর কোন আনন্দ আছে, জীবনের যে কোন অর্থ আছে, তাহা মনে হয় না। এই জগৎ বিষম দুঃখময় স্থান বলিয়া মনে হয়।

এই রোগ খুব সংক্রামক। যক্ষ্মা রোগীর কাশি ও থুতুর সঙ্গে এই রোগের অসংখ্য জীবাণু থাকে। তাহা শুষ্ক হইয়া বাতাসে ধূলিকণার সঙ্গে মিশিয়া উড়িতে থাকে এবং মুখ ও নাসিকাপথে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগের সৃষ্টি করে। যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবার সময়ও এই রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে,—থুতুর সূক্ষ্ম কণার সঙ্গে রোগজীবাণু ছিটকাইয়া গিয়া আক্রমণ করে। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদিগকে সারাদিন

হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করিতে হয় অথচ ভাল খাওয়া জোটে না, এক ঘরে ৫।৬ জনকে শুইতে হয়, ৫।৭টী ছেলে মেয়ের মা, ভাল খেতে পান না, স্বামী পুত্রের জন্য সারাদিন অভাবের সংসারে কাজ করিতে হয়, সূতিকায় অনেকদিন ভুগিয়াছেন এমন লোককেই সাধারণতঃ এই রোগ চট্ করিয়া ধরে। ঠাসাঠাসী ঘরবাড়ী, ধূলা ধোঁয়া যেখানে বেশী সেই সব সহরেই এই রোগ বেশী হয়,—নির্ম্মল বাতাসে ও প্রখর সূর্য্যকিরণে এই রোগ জীবাণু বড় টিকিতে পারে না। দুর্ভাবনাযুক্ত পরিশ্রম, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আর সহরবাস—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকের এই তিনই জুটিয়াছে; আর সহরে ছোট সামান্য বাড়ীতে সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের, ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলে মেয়ে কোলে সারাদিন তাহাদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া অভাবের সংসারে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়া যেটুকু ভাল জিনিষ, দুধ মাছ জোটে স্বামীপুত্রকে বেশীর ভাগ খাওয়াইয়া গৃহিণী নিজে যাহা খান তাহাতে রোগ জীবাণু প্রতিষেধ করিবার মত সামর্থ্য শরীরে থাকে না। কাজেই এখানে যক্ষ্মার "পোয়া বারো"।

খুক্‌খুকে কাশি, ঘুসঘুসে জ্বর, রাত্রে ঘাম, মাঝে মাঝে বুকে বেদনা, এই ভাবে রোগ সুরু হয়। তারপর কাশি বেশী হয়, কাশির সঙ্গে মুখ দিয়া মাঝে মাঝে রক্ত উঠে, রোগী দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, জ্বর সদাসর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে। ক্রমে কাশি খুব বেশী হয়, সাদা থোকা থোকা ফেনের মত ও পুঁজের মত অনেক কফ ক্রমাগত উঠে, রোগীর গলার স্বর বসিয়া যায়। অবশেষে একদিন হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ বন্ধ হইয়া রোগীর সকল কষ্টের অবসান হয়। নাড়ী এই রোগের সকল অবস্থায়ই দ্রুত চলিতে দেখা যায়। কেবল খুব দুর্ব্বল ও শেষ অবস্থায় ক্ষীণ (Thready) হইয়া পড়ে। এই রোগে অনেকদিন ভোগায়। সাধারণ ভোগকাল ছয় মাস হইতে তিন বৎসর।

প্রথম অবস্থায় নজর দিলে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেক রোগী আরোগ্য হইতে পারে। চিকিৎসার মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্থানে সর্ব্বদা

পরিষ্কার খোলা বাতাসের ব্যবস্থা, প্রচুর সূর্য্যালোকের সংস্পর্শে বাসগৃহ প্রাঙ্গণ ও অঙ্গন পূত রাখিবার বন্দোবস্ত, প্রচুর পরিমাণে খাঁটী দুধ ও পুষ্টিকর আহারের আয়োজন, নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার, স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগ বিশ্রাম, শান্ত প্রফুল্ল মনে সর্ব্বদা থাকিবার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি, এই সব করিতে হইবে। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দেখাশুনা ও পরামর্শ লইতে হইবে।

সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে এইরূপ দীর্ঘদিনের আয়োজন করা সম্ভবপর নয়। সাধারণ গৃহস্থের ঘরে সর্ব্বদা সতর্ক ব্যবস্থা রাখা, যাহাতে অপর কাহাকেও আবার রোগ না ধরে এমন করিয়া চলা, নিয়মিত সময়ে সুনিয়মে আহার পথ্য যোগান, রোগীর থুতু কাশি প্রভৃতি প্রণালীমত নিয়মিত ধ্বংস করা, রোগীর জন্য উপযুক্ত ঘরের ব্যবস্থা, এ সকল অত্যন্ত কঠিন এবং অনেক স্থলে অসম্ভব হইয়া পড়ে। পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে কত সময় কত কারণে অশান্তি, উদ্বেগ বা মনঃকষ্টের কারণ ঘটে, তাহা রোগীকেও বাদ দেয় না। একটী মারাত্মক রোগীকে লইয়া দীর্ঘদিন একটী সমগ্র পরিবারকে ব্যতিব্যস্ত রাখা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। অর্থনীতির দিক হইতেও ইহা জাতির বিষম অপচয়—রোগীর কাজ তো বন্ধই, তাহা ছাড়া তাহার জন্য পরিবারের উপযুক্ত আরো ২।১ জন লোককে কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। চেঞ্জের জন্য একটী রোগীকে লইয়া বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি। আরো একটী বিশেষ ভাবিবার বিষয় এই যে, এই মারাত্মক রোগকে যত সত্বর সম্ভব নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা দরকার—এইভাবে মিহিজাম, মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর, পুরী প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গায় ভাড়াবাড়ীগুলিকে এই রোগ ছড়াইবার কেন্দ্র হইতে দেওয়া আর উচিত নয়।

এই রোগের বিষম সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বাঙ্গালীকে আজ সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালার কাছে উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাঙ্গালীর পরিচালনে

অন্ততঃ দুই তিনটী "যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস" (Sanitorium) স্থাপন করিতে হইবে, স্বাস্থ্যকর স্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যাহাতে স্বল্প ব্যয়ে এক সঙ্গে অনেক রোগীর থাকার ও চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত পায় তাহা এখনই করা দরকার। কলিকাতার কাছে যাদবপুরে যে একটী এইরূপ ভাবের ব্যবস্থা কিছুকাল আগে হইয়াছে তাহা জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য ; তাহা ছাড়া জলবাতাসের আরো সুবিধাজনক স্থানে অনেক রোগী রাখা দরকার হইয়া পড়ে। কোন কোন রোগীর পুরী অঞ্চলের সমুদ্রের হাওয়া উপযোগী, আবার কোন কোন রোগীর পক্ষে দেওঘর মধুপুরের মত জায়গার আবহাওয়া বেশ ভাল। বাংলার বহুদূরে ধরমপুরে ও আলমোরাতে যে স্বাস্থ্যনিবাস আছে তাহার সুবিধাগ্রহণ সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভবপর নহে। শোনা যায় ধরমপুরার যক্ষ্মা নিবাসটী প্রথমে বাঙ্গালীর দ্বারা আরম্ভ হয়। লাহোরের ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ধরমপুরাতে পাতিয়ালা দরবার হইতে কিছু জমি লইয়া আরম্ভ করেন। পরে টাকার জন্য বড়লাট লর্ড কার্জ্জনকে লিখিলে তিনি পার্শী ধনীদের হাতে উহার ভার অর্পণ করেন। পার্শীদেরই কর্তৃত্বাধীনে উহা এখন পরিচালিত। আর দেখা গিয়াছে, আলমোরা বা ধরমপুরে থাকাকালীন কতকগুলি রোগী বেশ ভাল থাকে, শরীরের ওজনও বাড়ে, কিন্তু যেই বাংলায় আসিয়া কিছুকাল থাকিল অমনি আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। বাংলার কাছে যে সব ভাল স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে—সেখানের আবহাওয়া বাংলার সঙ্গে এমন কিছু আকাশ পাতাল তফাৎ নয় বলিয়া সে সম্ভাবনা অনেকটা এড়ান যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। বাংলার কাছে হইলে মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজনের পক্ষে এক একবার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া শুনিয়া যাওয়ারও একটী বিশেষ সুবিধা হয়।

দেওঘর হইতে ২।৩ মাইল দূরে 'দারওয়া' নদীর ধারে কোন উপযুক্ত জায়গা দেখিয়া এক শত দেড় শত বিঘা জমী লইয়া এইরূপ একটী 'স্বাস্থ্যনিবাস' স্থাপন করা যায়। মিহিজাম হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অজয়

নদীর ধারে এবং ৫।৬ মাইল দূরে বরাকর নদীর তীরে বিশেষতঃ ‘কল্যাণেশ্বরী’ মন্দিরের নিকট সুন্দর সুন্দর বিস্তীর্ণ পতিত জমি পড়িয়া আছে ; এ সকল জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্যও মনোরম—চারিদিকে উঁচু নীচু ঢেউখেলান খোলা মাঠ, মাঝে মাঝে নদীর ধারে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি, শাল পলাশ মহুয়ার জঙ্গল। এইরূপ কোন স্থানে অন্ততঃ এক শত বিঘা জমী লইয়া উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে দুই একটী যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিতে পারিলে দেশের একটী প্রধান অভাব দূর হয়। দেওঘর, গিরিডি, মধুপুর, মিহিজাম—ইহার মধ্যে মিহিজামই বাংলার বেশী নিকটে উত্তম স্থান। এ অঞ্চলে এ রূপ একটী স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিয়া সুবিধা হইলে, পরে পুরীর দুই তিন মাইল দক্ষিণে ‘স্বর্গদ্বার’ ছাড়াইয়া যে বিস্তৃত বালুর চর সমুদ্রের ধারে পড়িয়া আছে সেখানেও একটী যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা চলে। প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য দেশের লোকের সমবেত সাহায্য ও সহানুভূতি প্রয়োজন। পরে চলতি ব্যয়ভার রোগীদের পরিজনবর্গই স্বচ্ছন্দ মনে বহন করিবেন, কারণ ইহাতে তাঁহাদের আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিবার গুরুতর ব্যয়ভারের লাঘব হইবে এবং নিজেরা বহু উদ্বেগ, পরিশ্রম ও অশান্তির হাত হইতে মুক্ত হইয়া নিজ নিজ কাজে মনোযোগী হইতে পারিবেন। রোগকে সীমাবদ্ধ স্থানে রাখিয়া সুবন্দোবস্তে রাখিতে পারিলে এমন ভাবে সংক্রামিত হওয়ার ভয়ও অনেক কমিবে। দেশের বড়লোকেরা যখন কাহারও স্মৃতির উদ্দেশ্যে বা কোন সৎকাজের জন্য বহু টাকা এককালীন দান করিয়া যান তখন এইরূপ একটী সৎকাজের কথা মনে করিয়া ব্যবস্থা করিলে মহান্ উপকার হইবে।

বাংলার গ্রাম ও স্বাস্থ্য

আমাদের শরীরকে আশ্রয় করিয়াই যত কিছু। সবল সুস্থ দেহ সকল সম্পদ, সকল সুখের ভিত্তি। বাংলা দেশের, বিশেষ করিয়া গ্রামগুলির স্বাস্থ্য আজ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। স্বাস্থ্যহীন হইয়া দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিতে করিতে কত লোক যে অকালে মরিতেছে তাহা ভাবিলে পৃথিবী দুঃখময় স্থান বলিয়া বোধ হয়। দারুণ অবসাদ মনকে পীড়িত করে।

প্রকৃতি তাঁহার নিয়ম কানুন না মানিয়া, না বুঝিয়া চলিলে কাহাকেও রেহাই দেন না। কারণ ও তাহার প্রতীকার জানিয়া যতদূর পারা যায় এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। স্বাস্থ্যের জন্য কয়েকটা জিনিষ একান্ত আবশ্যক, যথা—নির্ম্মল বায়ু, পরিষ্কার জল, প্রচুর সূর্য্যালোক, উপযুক্ত খাদ্য, আর শরীর সুস্থ রাখার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার কতকগুলি নিয়ম জানা ও পালন করা। এখন দেখা যাক গ্রামে এই সম্বন্ধে কোথায় কি অভাব।

গ্রামের মধ্যে প্রথমে ঢুকিলেই মনে হয় যে একখানি কুঠার হস্তে প্রবেশ করি, যত গাছ আর বাঁশঝাড়গুলির উপর কুঠারের উপর কুঠার হানিয়া দূর করিয়া ফেলি 'কোণে কোণে যত লুকান আঁধার।' গাছ, বাঁশঝাড় আর ঝোপে দিনের বেলায়ই যেন গ্রামখানিকে অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে মানবজাতির শত্রুরা টিকিতে পারে না, যত কিছু রোগের জীবাণু বলুন, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বলুন, বিষাক্ত সাপ বলুন, সকলেই এই উজ্জ্বল সূর্য্যালোক হইতে সরিতে বাধ্য। বেশীক্ষণ সূর্য্যালোকে থাকিলে সকল রোগ জীবাণুই মরিয়া যায়। ঘরের কাছেই এই গাছপালার অন্ধকার আশ্রয় দিতেছে মানুষের মৃত্যুর দূতগুলিকে। গাছ আর বাঁশঝাড়গুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া দরকার হইয়াছে সমস্ত গ্রামখানিকে আগাগোড়া আকাশের আর উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের স্পর্শ দিতে।

শুধু যে সূর্যালোক বন্ধ করিয়াছে এই গাছপালা তাহাই নহে। যে বাতাসের প্রবাহ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত আবশ্যক, গ্রামের চারিদিকের বাঁশঝাড়ের দুর্ভেদ্য ব্যূহ গ্রাম হইতে আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহার মুক্ত গতিকে। উপরন্তু গাছগুলি রাত্রে কার্বন নামক এক প্রকার দূষিত বাতাস ছাড়িয়া গ্রামবাসীকে দুর্বল করিয়া দিতেছে। আর গ্রাম যে বেশী সময় স্যাতসেঁতে থাকে তার কারণ এই গাছগুলির জন্য সূর্য্যালোক আসিয়া গ্রামের ভিতরের জলীয় হাওয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিতে পাবে না। যে মশা ম্যালেরিয়ার বাহন বলিয়া এত ভীষণ তাহারা আরামে গজাইতে থাকে সেই সব পুকুর আর ডোবার ধারে যেখানে গাছপালা আর ঝোড় জলের ধার হইতে ঢাকিয়া রাখে সূর্য্যালোক।

গাছপালা আর বাঁশঝাড়ের জন্য গ্রামখানি খোলাখুলি ভাবে স্পর্শ পায় না মুক্ত উদার আকাশের, চাঁদের আলোর পরিপূর্ণ তরঙ্গ-হাসির মত আনন্দ ছাইয়া পড়িতে পারে না গ্রামের উপর; আর অগণিত তারকার চাহনী অন্ধকার রাত্রির সময় গ্রামের উপর তার বৈচিত্র্য ছড়ায় না। মানুষের মনকে উদার প্রশান্ত ও আনন্দময় করিয়া তুলিতে এ সকলের খুব দরকার। আওতায় আড়ালে বড় কিছু গজাইতে সহজে পায় না। আকাশ হইতে যে জীবনধারা পৃথিবীর বুকে আসিয়া অলক্ষ্য স্পর্শে সকলকে সঞ্জীবিত করে তাহার বাধা জন্মান উন্নতির অন্তরায়।

স্বীকার করি গাছ আর বাঁশঝাড় গ্রামের খুব প্রয়োজনীয় জিনিষ আর দেশের সম্পদ। কিন্তু বাঁশ টানিয়া আনিবার পরিশ্রম বাঁচাইতে গিয়া এ মৃত্যুকে টানিয়া আনা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। গ্রাম হইতে দুই তিনশত হাত দূরে মাঠে উত্তর পশ্চিমদিকে একজায়গায় সকলে প্রয়োজনমত প্রত্যেকে পাচ দশ কাঠা জমি লইয়া মোট দশ বার বিঘা বাঁশঝাড় রাখিলেই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আম কাঁঠাল প্রভৃতি বাগানেরও ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলের এক জায়গায় বাগান থাকিলে চোরের উপদ্রবেরও ব্যবস্থা সহজ হইবে, স্বাস্থ্যের সঙ্গে

অন্যান্য বিষয়ের মত সমবায় নীতির কার্য্যকারিতাও ক্রমে উপলব্ধি হইবে।

আজ যে রকম অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় বরং গ্রামখানিকে বাগান আর বাঁশঝাড় বলিয়া ছাড়িয়া মাঠে গিয়া নূতন ঘরবাড়ী করিয়া গ্রামের পত্তন করাই সহজ। দেখা যায়, কোন কোন জায়গায় পুনঃপুনঃ রোগ ও মৃত্যুর জ্বালায় অস্থির হইয়া কতকগুলি পরিবার গ্রামের বাহিরে মাঠে নূতন পাড়ার পত্তন করিয়া রোগজ্বালার হাত অনেকটা এড়াইয়াছেন। মাঠের ও চরের উপর নূতন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

তার পর জলের কথা। গ্রাম হইতে গাছপালা সরাইলে পাতা ও ডালপালা জলে পড়িয়া পচিয়া জল খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা দূর হইবে। পুকুরগুলি অধিকাংশই অনেকদিনের পুরাণ, এজন্য সংস্কারাভাবে মজিয়া অতিরিক্ত পাঁক হইয়া, আর চারিদিকে শ্যাওলা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদে পূর্ণ হইয়া, খারাপ জলের আকর হইয়াছে। বাংলা দেশ নিম্নভূমি, এজন্য স্বভাবতঃ কিছু আর্দ্র বলিয়া বেশী পুকুর বা ডোবা গ্রামে থাকা ভাল নহে। একটী, কি গ্রামের আয়তন বুঝিয়া দুইটী, বড় পুকুর গ্রামে রাখিয়া আর সব মাটি দিয়া ভরাট করা দরকার। যে পুকুরটী রাখিতে হইবে সেইটী সংস্কার করিয়া কাটাইয়া তাহার মাটী তুলিয়া বাকীগুলি ভরাট করিয়া ফেলিতে হইবে। এ সব ব্যয়সাধ্য কাজ এক সমবায় নীতিতেই সম্ভব। গ্রামের সকল লোক একযোগে কাজ করিলে এবং যে বড় পুকুরটী থাকিবে তাহা গ্রামের সকলের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিগণিত করিতে পারিলে তবেই ইহা সম্ভব। পানীয় জল এবং যদি পারা যায়, স্নানের জলও ইঁদারা কি নলকূপ কিংবা সাধারণ কূপের জলেই প্রশস্ত। কারণ ইঁদারা বা নলকূপের জল, পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা নির্ম্মল ও সর্ব্বাংশে স্বাস্থ্যপ্রদ। সংক্রামক রোগের আশঙ্কাও ইহাতে অনেক কম। পুকুর অপেক্ষা ইঁদারা ও নলকূপ কম ব্যয়সাধ্য। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উপর উপযুক্ত নির্ব্বাচন দ্বারা গ্রামবাসীর রীতিমত হাত আসিলে এ বিষয়ে গ্রামের অনেক সুবিধা হইবে।

বদ্ধ জলের আর্দ্র হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক। এজন্য গ্রামের সন্নিকটে যেখানে বিল বা বড় জলা আছে তাহার সহিত নিকটবর্ত্তী নদীর খাল কাটিয়া যোগ রাখা দরকার যাহাতে সেই খাল দিয়া নদীর জল সমস্ত মাঠ ঘাট প্লাবিত করিয়া বর্ষাকালে সমস্ত আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া লইয়া যায় এবং বদ্ধ জলেরও দোষ নষ্ট করিতে পারে। আবার সেই খাল দিয়া অতিরিক্ত জল কার্ত্তিক মাস মধ্যে বাহির হইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলিকে শুষ্ক ও খটখটে করিয়া তুলে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে যেমন উপযোগী বানের জলের পলি পড়িয়া ক্ষেত্রকে উর্ব্বরা করিতেও তেমনি আবশ্যক। আর নদীর সহিত যোগ থাকিলে গ্রামের মৎস্য-সম্পদ বাড়িবার একটী প্রধান উপায় এরূপে হইতে পারে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। শুধু এক গ্রামের নয় নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের লোকের একতাবদ্ধ হইয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

কয়লা, জল, আগুনের যোগান না দিলে যেমন কলের এঞ্জিন অচল হয়, আমাদের শরীর ঠিক রাখিতে হইলে তেমনই উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। দরকার মত ভাল খাবার জিনিষ না পেলে শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখা যায় না এবং শরীর রোগের আক্রমণ হইতে নিজকে যুদ্ধ করিয়া বাঁচাইবার ক্ষমতা হারায়। টাটকা খাঁটি দুধ, ঘি, মাখন, মাছ, ডাল, ভাত, রুটী, মাংস, শাকশবজী প্রভৃতি মানুষের শরীর রক্ষার যত কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ সমস্তই গ্রামে উৎপন্ন হয়। কিন্তু মজার কথা, টাকার টানে গ্রামবাসী তাহার উৎপন্ন খাদ্যের ব্যবহার নিজে করিতে পারে না। টাকার টানে কোনরূপে সামান্য খাদ্যে দুই বেলা কতকটা উদর পূরণ করিয়া বাকীটা অর্থের দায়ে বিকাইতে বাধ্য হয়। এইখানে খাদ্যসমস্যার সহিত অর্থসমস্যা জড়িত, ইহা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে। তবে আমরা এইখানে উল্লেখ করিতে পারি, উপযুক্ত খাদ্যের উৎপন্নের পরিমাণ চেষ্টা করিলে অনেক বাড়ান যাইতে পারে। অনেক গ্রামেই ভাল করিয়া চেষ্টা করিলে প্রচুর পরিমাণে দুধ, মাছ, ডিম, ডাল, চাল, মাংস, শাক প্রভৃতির

উৎপাদন হইতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞান-সম্মত ব্যবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এ সকল সম্ভব হইবে। বর্ত্তমানে গোপালন ধর্ম্মের মত মনে করিয়া সকলেরই এদিকে চেষ্টা করা উচিত। টাটকা দুধই সকল খাদ্যের সেরা এবং সকল দিক দিয়া দেখিলে গ্রামবাসীর পক্ষে সুলভ। ইচ্ছা উদ্যোগ ও চেষ্টা এদিকে বিশেষ করিয়া দিতে হইবে।

তারপর সকলে যাহাতে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিগুলি জানিতে পারে তাহা না করিতে পারিলে নিজেদের আন্তরিক চেষ্টা জাগরিত হইবে না। শরীর গঠন ও পালন করিতে কি কি নিয়মে চলা দরকার, কোন কোন সংক্রামক রোগ মানুষকে কেমন করিয়া আক্রমণ করে, কেমন করিয়া তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, গর্ভাবস্থায় প্রসূতির কি কি নিয়মে থাকিলে সবল সুস্থ সন্তান জন্মে, সন্তানকে কেমন করিয়া স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া গড়িয়া তোলা যায় প্রভৃতি ম্যাজিক লণ্ঠন দ্বারা গ্রামবাসী যাহাতে জানিতে ও বুঝিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, এন্টিম্যালেরিয়া সোসাইটী প্রভৃতির করা দরকার। বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের এটা কর্ত্তব্যের মধ্যে।

গ্রামই দেশের পনের আনা জায়গা। গ্রামের পঙ্গুত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা দূর করিয়া শ্রীবৃদ্ধি না করিতে পারিলে জাতির কল্যাণ কোথায়?

আমাদের অর্থ-সমস্যা ও কলকারখানা

মানুষ সত্যের সন্ধান ও অনুশীলন করিতে করিতে শক্তির দেখা পাইয়াছে। বাষ্পীয় শক্তি (steam power) ও বৈদ্যুতিক শক্তি (electric power) তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিপূর্ব্বেই ধরা দিয়াছে এবং ক্রমে অণু পরমাণুর (electron and proton) অন্তরে বিধৃত এক সূক্ষ্ম মহাশক্তি তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিতেছে। এই সকল শক্তির পরিচয় পাইয়া বুদ্ধি ও প্রতিভা খাটাইয়া মানুষ নানা কলকারখানা আবিষ্কার করিয়া শক্তিকে নিজের কাজে লাগাইয়াছে। উদ্দেশ্য—ইহার দ্বারা মানবসমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। ইহাতে মানুষের কঠিন কায়িক শ্রমের লাঘব হইবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে বহুগুণ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপন্ন হইবে।

বাস্তবিকই কলকারখানার বিপুল, বিরাট ও ক্ষিপ্র কাজ দেখিয়া আজকাল আশ্চর্য্য হইতে হয়। রেল, জাহাজ, মোটর, এরোপ্লেন, বেতার মানবসমাজের গতি কি দ্রুত ফিরাইতেছে! কাপড়ের কল, লোহার কারখানা, তেলকল, চালকল প্রভৃতি কি রাশি রাশি জিনিষ রোজ তৈরি করিতেছে! কয়লার খনি, পেট্রোল ও তৈলের খনিতে কলের সাহায্যে বিপুল জিনিষ উঠিতেছে। কৃষিকার্য্যেও কলের সাহায্যে বেশী উৎপাদনের উপায় হইতেছে। এত আবিষ্কার এত সুবিধা যখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে তখন মানুষের এত দুঃখ কেন? মানুষের সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিবার যখন এত ব্যবস্থা হইতেছে তখন এত দুঃখ, দারুণ অর্থ-সমস্যা ও শ্রেণীবিরোধ কেন মানুষের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিতেছে? আমাদের দেশের কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিলাম, জগতের যে-সব দেশে কলকারখানার বিপুল প্রতিষ্ঠা সেখানেও কি হাহাকার! জগতের আকাশ-বাতাস

যখন লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্দ্দশার ক্রন্দনে ধ্বনিত, তখন আমাদের ভাল করিয়া বুঝা ও ভাবা দরকার এই মহান্ কল্যাণের ক্ষেত্রে কি করিয়া এত অমঙ্গলের উদ্ভব।

ইহার কারণ খুঁজিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে যে, কলের সাহায্যে যেমন অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই সঙ্গে সেই লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের এতদিনের অবলম্বন হারাইয়া বেকার হইয়া পড়িতেছে। যেমন একটা কাপড়ের কলে এক শত তাঁতির দ্বারা দশ হাজার তাঁতির কাজ হইতেছে। ইহাতে কাপড় সস্তা হইতেছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ কাপড় উৎপন্নের উপায় হইয়াছে ; কিন্তু নয় হাজার নয় শত তাঁতির জীবিকা গিয়াছে, তাহারা বেকার হইয়া হয় কৃষিকাজ ধরিয়াছে না হয় অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। তাহাতে কৃষি ও অন্য কাজে দারুণ প্রতিযোগিতা আসায় জগতে দুঃখ বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সকল ক্ষেত্রেই কলের দ্বারা বেকারের সংখ্যাই ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এমন কি, যেখানে কৃষিকাজেও কলের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, সেখানে কৃষককেও বেকার করিয়া তুলিতেছে। কলের মোটর লাঙ্গল, শস্যকাটা কল, রোপণের কল প্রভৃতির সাহায্যে যাহা করা সম্ভব তাহাতে একজন কৃষক সামান্য জনকতক মজুরের সাহায্যে এক শত জন কৃষকের উপযুক্ত জমি চাষ আবাদ করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে। সহজে বেশী উৎপন্ন হইবার সুবিধা যেমন একদিকে হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। এখন এই বেকার-সমস্যাই বর্ত্তমান যুগে প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তারপর, যাহারা কল আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে এবং কলের কাজেই গতর খাটাইতেছে তাহাদেরই বা কি দশা! শুধু মুষ্টিমেয় জনকতক মালিক, ডিরেক্টর, ম্যানেজার বিপুল সম্পদের অধিকারী হইতেছেন, কিন্তু যাহাদের সাহায্যে কল খাটাইয়া তাহাদের বিপুল সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে তাহারা কি দুর্দ্দশায় আছে তাহা একবার কুলিবস্তীগুলির দশা যাঁহারা

দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। পরিশ্রমী মানুষের যে এত দুঃখ হইতে পারে তাহা কে জানিত? স্বামী-স্ত্রী পরিশ্রম করিয়া যাহা উপায় করে তাহাতে দুঃখে কষ্টে কোনরূপে চলে, কিন্তু যখনই কেহ অসুখে পড়ে কি মারা যায়, তখন তাহার স্ত্রীপুত্রের দুঃখ অবর্ণনীয়। কারণে অকারণে সামান্য দোষেই, কি মনিবের অল্প বিরাগের কারণ ঘটিলেই তাহার কাজটি যাইবে; ছেলেমেয়ে লইয়া কোথায় যাইবে এই আশঙ্কা তাহাকে সতত মানুষের অধম করিয়া রাখিয়াছে। এই দুর্দ্দশার দৃশ্য চোখে দেখিলে আর কলের দ্বারা কোন কল্যাণ হইবে এমন আশাই মনে আসে না। ধর্ম্মঘট কখন ইহার প্রতিকার করিতে পারে না। পর্য্যাপ্ত বেতনের দাবী করিয়া এবং কাজের সময় কমাইবার দাবী করিয়া ধর্ম্মঘট করিলে অনেক সময় ধর্ম্মঘটকারী মজুরদের অর্থকষ্টে পড়িয়া মাঝখানেই ধর্ম্মঘট মিটাইয়া ফেলিতে বাধ্য হইতে হয়, কারণ কারখানার কর্ত্তারা অনেক লাভ খাইয়া অনেক টাকা জমাইয়াছেন, অনেক দিন কল বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা যে ক্ষতি সহ্য করিতে পারেন, 'দিন আনে দিন খায়' যে-সব মজুর তাহাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আর যদিই বা শ্রমিকগণের জয় হইয়া বেতন-বৃদ্ধির একটা রফা হয় তবে সেই বেশী টাকার দায় কারখানার মালিকরা উৎপন্ন জিনিষের দাম বাড়াইয়া সাধারণের উপর (indirect tax) চাপাইয়া দিবেন। ইহাতে মজুরদেরও প্রয়োজনীয় জিনিষ বেশী দামে কিনিতে হয় বলিয়া মজুরী বেশী পাওয়ায় তাহাদের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি হয় না। ধর্ম্মঘটের ফলে কর্ত্তাদের বিপুল সম্পদ বাড়াইবার কোন অন্তরায় হয় না, শুধু সাধারণের ভাগ্যে ক্ষতি আসিয়া জুটে। মাঝে মাঝে দায়ে পড়িয়া বেতনবৃদ্ধি বা সামান্য দুই একটা বিষয়ে সামান্য একটু সুবিধা দিয়া মানুষে-মানুষের মধ্যে এই নিদারুণ বৈষম্য কখনও দূর করা যাইবে না। চাই আমূল পরিবর্ত্তন।

রুষ দেশ এক আমূল পরিবর্ত্তনই ঘটাইয়াছে। অবস্থার বৈষম্য যাহাতে মানুষের কষ্টের কারণ না হয়, সকলেই যাহাতে এই বিপুল ধন

উৎপাদনের ক্ষেত্র, কলকারখানার সমৃদ্ধি ঠিকমত ভোগ করিতে পায় এজন্য সেখানে সমস্ত কলকারখানাকে সাধারণের সম্পত্তি করিয়া ষ্টেটের সাহায্যে চালাইতেছে। এ যেন সকল দেশ এক যৌথ-পরিবারভুক্ত ; সমাজ, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকলের কল্যাণ এক বিরাট কেন্দ্র হইতে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিগণ নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এমন ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সাধারণের সুখসুবিধা বলি দেওয়া আর সম্ভব নয়। সেখানে নাকি কাজ বেশ ভালই হইতেছে, শুনিতেছি অন্য দেশের তুলনায় সেই দেশের লোক কল্যাণের পথে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। আমাদের দেশের মনীষী নেতা স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং বরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রুষদেশে গিয়া সমস্ত দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও বলেন, ফল ভালই হইতেছে।

জগদ্বিখ্যাত বিরাট কারখানার প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রেষ্ঠ ধনী হেন্‌রী ফোর্ড অন্য উপায়ে উভয় দিক বজায় রাখিয়া এইরূপ আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়াও এই সমস্যার সুন্দর সমাধান হইতে পারে বলিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি বইয়ে ('My Life and Work' এবং 'To-day and To-morrow') তিনি কিরূপে ইহার সমাধান করিয়াছেন, কি নীতি ও নিয়মে চলিয়া সকলেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া বিরাট কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কারখানায় নাকি কেহই অসুখী নাই, নিজ নিজ কর্ম্মশক্তি ও বুদ্ধি খাটাইয়া শ্রমিক, কর্ম্মচারী প্রভৃতি সকলেই পরিমিত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া অন্য সকল জায়গা অপেক্ষা এখানে বেশ ভাল বেতন ও বোনাস বা লাভের অংশ পাইতেছে। তাঁহার কারখানায় কখনও ধর্ম্মঘট হয় না, সকলেই বুঝিতে পারে যে, কারখানায় তাহাদেরও কল্যাণ হইতেছে এবং উৎপন্ন জিনিষের দামও ব্যবস্থার গুণে যতদূর সম্ভব কম করিতে পারায় সাধারণের এই কারখানার সুবিধা ভোগের সুযোগ ঘটিয়াছে। তাঁহারই

বই পড়িয়া এবং তাঁহার কাজ দেখিয়া মনে হয়, তিনি কলকারখানার ভিতরের সত্য এবং কল্যাণের দিক উদার দৃষ্টিতে ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত বই 'To-day and To-morrow' হইতে কয়েক স্থল সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

"যদি অন্ততঃ জগতের প্রত্যেক লোকের যোগ্যতা অনুসারে ভালভাবে খাওয়া-পরার ও বাসের ব্যবস্থা না করিয়া দেওয়া হয় তবে মানুষের এই সভ্যতার কোনো অর্থই হয় না। এইটুক না করিয়া তুলিতে পারিলে মানব সভ্যতা ব্যর্থ বলিতে হইবে।"

মনীষী দার্শনিক নীট্‌সের মত এই লক্ষ্মীর বরপুত্রের দৃষ্টির আগে জগতের দারিদ্র্য অতি কুৎসিত আকারেই দেখা দিয়াছে,—দারিদ্র্য তাঁহাকে বেদনা দিয়াছে।—"জগৎ দারিদ্র্যের কাছে হার মানিয়াছে।" কথনও এমন করিয়া হার মানিয়াছে যে, দারিদ্র্যকেই গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

"ভিক্ষা, দান প্রভৃতির দ্বারা অক্ষম ও দরিদ্রের প্রকৃত হিত হয় না, যে হিতচেষ্টা তাহাকে সক্ষম করিয়া তুলিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দেয় না তাহা তাহার অ-হিতকারী।"

"আজ আমরা সবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, যে-আলোচনায় সাধারণ জনের কল্যাণ নাই তাহা বিফল।"

"কলকারখানার কর্ত্তারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, কলকারখানার অন্তরের সত্য হইতেছে সমস্ত মানব-সমাজের কল্যাণ এবং কলকারখানাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা ভুল। যে মানুষ কল ক্রয় করে কিংবা চালায়, কল তাহার সম্পত্তি নহে; ইহা সর্ব্বসাধারণের।"

"আমরা যাহাকে কলকারখানার যুগ বলি তাহা আসলে হইতেছে শক্তির যুগ; এই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জয় করিয়াছে এবং ইহারই কল্যাণে উৎপাদন অনেক বেশী এবং সস্তা করিয়া জগতের সকলেরই সম্পদভোগ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুবিধা হইবে।"

"কঠোর কায়িক শ্রমের গুরুভার হইতে মুক্ত করিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও অবসর দিবে—মানুষ তাহার অন্তর রাজ্যের বিশাল সম্ভাবনীয়তাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে।"

কারখানার কর্ত্তারা আজও ইহা ধরিতে পারেন নাই যে, কলকারখানা জগতে এক নূতন কল্যাণের যুগ আনিবে। ইহাকে তাঁহারা নিজের হীন স্বার্থ প্রচেষ্টায় লাগাইতে গিয়া এই দারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন। "কলকারখানা প্রকৃত পরিমাণে ধন বৰ্দ্ধিত করিয়াছে; কিন্তু ধন বিভাগের দোষে প্রথমত ইহা ধনীর ধন বাড়াইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্যই বাড়াইয়া দিল। কারখানার মালিকরা বুঝিতে পারেন নাই যে, কারখানা পৃথিবীকে নূতন রূপ দান করিবে।"

জাতিবিরোধ এবং যুদ্ধও এই বৈষম্য ও দারিদ্র্যের ফল। "যতদিন সারাধণ লোক দারিদ্র্যে কষ্ট পাইবে এবং মানুষ ঠিকভাবে চিন্তা করিতে না শিখিবে—ততদিন জগতের এই যুদ্ধের ধ্বংসলীলাও চলিবে। যুদ্ধ জগতকে রিক্ত করে মাত্র, কোন বিত্ত দান করে না। যুদ্ধ দারিদ্র্যের, বিশেষতঃ চিন্তার দারিদ্র্যের ফল।"

কলকারখানার মালিককে কলকারখানাকে সাধারণের কল্যাণের ক্ষেত্র রূপেই দেখিতে শিখিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সস্তায় ভাল উপযোগী জিনিষ উৎপন্নের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে (ইহাকে ফোর্ড "service motive" বলেন), আর যাহাদের সাহায্যে কল চালাইয়া কলের লাভ ও উৎপাদন হইবে তাহাদিগকেও অংশীদারের মত মনে করিতে হইবে,—বুঝিতে হইবে তাহাদের শ্রম ও কারখানার কর্ত্তার টাকা ও বুদ্ধি উভয়ে মিলিয়া এই লাভ হইতেছে সুতরাং শ্রমিককে তাহার উপযুক্ত অংশ যতদূর সম্ভব বেশী বেতন ও লাভের অংশ দিতে হইবে (ইহাকে ফোর্ড "wage motive" বলেন), ইহাতে কারখানার শ্রমিকগণকেও প্রাণপণে ভাল ও বেশী উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করিবে। নতুবা সুফল দুরাশা।

কৃষকের কল্যাণও উদারচেতা কর্ম্মী ফোর্ডের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি দেখিলেন কলকারখানা অনেক আগাইয়া গিয়াছে আর কৃষি তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া এখনও বহু পিছনে পড়িয়া আছে—তাই সুদূর কৃষিক্ষেত্র হইতে লোক কারখানায় না টানিয়া যাহাতে কারখানার ছোট ছোট অংশ শহর হইতে গ্রামে দূরে দূরে বসাইয়া কৃষককেও মাঠের কাজের সঙ্গে তাহার অবসর সময়ে কারখানার কাজের সুবিধা দেওয়া হয় সেই চেষ্টা করিয়াছেন।

"অনেকে মনে করেন, কল ও কৃষি আলাদা রকমের কাজ, পরস্পরে মিল নাই। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা বেশ খাপ খায়—কৃষিকাজের এক এক সময় কাজকর্ম্ম থাকে না, আবার কলকারখানার এক এক সময় মন্দা চলে। যদি দুইটি পরস্পর সহযোগিতার ক্ষেত্র পায় তাহাতে সকলের পক্ষে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য এবং অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারিবে।"

সমগ্র মানবের কল্যাণের প্রেরণা জাগিয়াছে কর্ম্মী ফোর্ড-এর অন্তরে। "আমরা প্রতি মানবকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ দিতে চাই, যে-সুযোগের সাহায্যে মানুষ বাঁচিয়া সুখ পাইবে।"

রুষিয়ার বলসেভিক কর্ম্মীদের কাজ এবং হেনরী ফোর্ডের মত উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন কর্ম্মীর কাজ দেখিয়া আশা হয়, যে কলকারখানার মধ্যে মানুষের যে কল্যাণ নিহিত আছে তাহার স্ফুরণ একদিন হইবে। যে দিক দিয়াই দেখি, প্রকৃত কল্যাণ ফুটাইতে হইলে মানুষকে হীন স্বার্থ ছাড়িয়া সমগ্রের মঙ্গল দেখিতে শিখিতে হইবে। নতুবা যাহা হইবে কল্যাণের আকর, যাহার সাহায্যে গড়িয়া উঠিবে লক্ষ্মী, শ্রীসম্পন্ন পরিপূর্ণ মানবসমাজ,—তাহাই স্বার্থপর অসুর-স্বভাব লোকের হাতে হইয়া দাঁড়াইতেছে বিরোধ, বৈষম্য ও দুঃখের মূল। মানুষ নীচের বৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া সত্যকার দৃষ্টিতে জগৎ দেখিতে শিখিলে তাহার অর্থ-সমস্যা ও বৈষম্যের সমাধান হইবে। মানুষ শক্তির দর্শন পাইয়াছে, কিন্তু সত্যের দর্শন এখনও পায় নাই। তাই শক্তিকে পাইয়াও তাহার প্রকৃত কল্যাণ হয় নাই। যেদিন

সে সত্যের দর্শন পাইবে, সেদিন হইতে শক্তিকে প্রকৃত মঙ্গলের পথে চালাইতে পারিবে। অল্প পরিমিত পরিশ্রমে জগতের সকল লোকেরই তখন সুখে-স্বচ্ছন্দে খাওয়া পরা ও বাসের ব্যবস্থা হইবে। সত্যের অনুশীলনে সৌন্দর্য্য, শক্তি ও আনন্দে-ভরা এক নূতন যুগ আসিবে। তাই কলকারখানার ভিতরের প্রকৃত মঙ্গলকে ফুটাইতে হইলে মানুষকে প্রথমে সত্য দৃষ্টি লাভ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে কলকারখানা যে ক্রমাগত বেকারসমস্যা বাড়াইতেছে তাহারও কারণ সত্যদৃষ্টিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। জগতের প্রত্যেক লোককে সুশিক্ষিত করিতে হইলে, প্রত্যেকের জন্য স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য পূর্ণ আবাস নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইলে, সকলের আনন্দবিধানের ক্ষেত্র ফুটাইতে হইলে, কলাবিদ্যা ও স্থাপত্যের দেশময় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইলে সহস্র সহস্র লোকের কি বিপুল বিরাট কাজ পড়িয়া আছে তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। জগতে কাজের ক্ষেত্র অপরিসীম, অথচ মানুষ ব্যবস্থার দোষে, দৃষ্টিহীনতায় বেকার হইয়া পড়িতেছে। এখানে সমস্যা হইতেছে সমগ্রের। সত্যদৃষ্টি রাষ্ট্র ও সমাজের মনে পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার যে প্রেরণা আনিবে তাহাতে কাজের ক্ষেত্র ও পরিসর এত বাড়িবে যে, বেকারসমস্যার কথা তখন উঠিতেই পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতি, প্রতিভা ও অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণা মত কাজের ক্ষেত্র পাইবে এবং কর্ম্ম তখন প্রাণে সৃষ্টির নিবিড় আনন্দ ও শক্তি জাগাইবে। হেনরী ফোর্ডের কথায় আবার বলি—

The function of the machine is to liberate man from brute burdens and release his energies to the building of his intellectual and spiritual powers for conquests in the fields of thought and higher action. অর্থাৎ—কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের গুরুভার হইতে মুক্ত করিয়া কলকারখানা মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ

ও অবসর দিবে—মানুষ তাহার অন্তর-রাজ্যের বিশাল সম্ভাবনীয়তাকে ফুটাইতে পারিবে।

কলকারখানা মানুষকে বেকার করে নাই, কলকারখানা জগতে যে নূতন কল্যাণের যুগের সূচনা করিবে মানুষ তাহাকে ধরিতে ও বুঝিতে না পারিয়াই বেকার হইয়াছে। গতানুগতিক চিন্তার ধারা ও কাজের ধারা বদলাইয়া নূতন চোখে জগৎ দেখিতে শিখিতে হইবে।

জগতের প্রগতি

ইদানীং শুধু নিজের দেশের কথাই মানুষের সমস্যার বিষয় নহে, সকল দেশেই সমস্যা প্রবল এবং সমস্ত জগৎ যেন একসূত্রে গাঁথা হইয়া উঠিতেছে। মনীষী অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় "The world is tending to function as one organism".—Kalki। জগতে আর সবার কথা বাদ দিয়া শুধু নিজের দেশের বা জাতির উন্নতিপ্রচেষ্টা আজ আর জয়লাভেও সফল হয় না। "...an exclusive nationalism does not pay even the victorious nations" ('What I Believe' —Bertrand Russell)। ক্রমবর্দ্ধমান সমর-সম্ভার যোগাইতে আর জয়ের মূল্য দরুণ সুদ দিতে দিতে যুদ্ধে জয়লাভেও আর কোন সার্থকতা নাই। বিজিত ও জয়ী উভয়কে যে লক্ষ লক্ষ মানবজীবন বলি দিতে হয়, জনপদ, জাহাজ, বাণিজ্যসম্ভার ও শিল্পকলার যে বিপুল ধ্বংসলীলা ঘটে, তাহাতে জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের বিরতি না ঘটিলে কাহারও আর নিস্তার নাই। তাই লর্ড ব্রাইস্ বলেন, "If we do not destroy war war will destroy us." আজ তাই সকলেরই বুঝা দরকার, মানুষের সমস্যাগুলি কোথায় জট পাকাইয়া পাকাইয়া জগতের প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

জট যে পাকাইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই। যাঁহাদেরই দৃষ্টি খুলিয়াছে এবং যাঁহারা এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের চোখে আজ মানুষের এই অক্ষমতা, অন্তরের দৈন্য সুস্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে। জগতের এমন দুরবস্থা ঘটিবার কথা নহে। প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও কুশলী দৃষ্টি আজ মানুষের হাতে এমন ক্ষমতা আনিয়াছে যে, জগতে কোথাও অভাব ও দৈন্য থাকার কথা নহে।

অর্থনীতি-শাস্ত্রবিদ্ সার আর্থার সল্টারের মতে প্রাচুর্য্যের মধ্যে এই দীনতা মানুষেরই বুদ্ধির দোষে, তাহার অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানে অসম বন্দোবস্তের জন্যই ঘটিয়াছে এবং তাহা দূর করাও সম্পূর্ণ সম্ভব।

"Ours is a problem of the impoverishment that comes with plenty. It comes from defects in human organisation and direction, from imperfect planning, from weakness in our financial and distribution system—from essentially remediable evils and essentially removable causes."—Recovery.

মনীষী এইচ, জি, ওয়েল্‌স'ও বলেন,—

"That unemployment and poverty are avoidable is for these authorities (Sir Joseph Stamp, Prof. Miles Walker, F.R.S.) not a mere opinion: it is a straight forward statement of fact."—Work, Wealth and Happiness of Mankind.

মানুষ তাহার সমস্যার জটগুলি বুঝিয়া প্রতীকার করিতে পারিলে সমস্ত জগৎ সুন্দর সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। জগতের মনীষিগণের মতে তাহা কিছু অসাধ্য কাজও নহে। সুতরাং এই সকল আলোচনায় আমাদের লাভ আছে।

প্রথমতঃ দেখি, অর্থের বৈষম্য ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে এমন অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে যে, মনীষিগণ এখন গতানুগতিক অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষেত্রগুলিকে নূতন করিয়া পরীক্ষকের চক্ষুতে দেখিতেছেন। দেখা যাইতেছে—মানুষকে অর্থ মোহগ্রস্ত করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার উপার্জ্জন ও সঞ্চয়ের ইতিহাস কলঙ্ক ও কদর্য্যতায় পূর্ণ। নিরপেক্ষ মনীষী এইচ, জি, ওয়েলস্ "Work, Wealth and Happiness of Mankind"—এ অর্থের লোভ মানুষকে কিরূপ কদর্য্য ও নীচ করিয়াছে, তাহা

দেখাইতে দক্ষিণ-মধ্য-আমেরিকার পুটুমেয়ো নদীর ধার বহিয়া (Putumayo River) রবারের বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ও ব্যবসায়ের এবং আফ্রিকার কঙ্গো ষ্টেটে রবার-ব্যবসায়ের যে ইতিহাস ও বিবরণ দিয়াছেন (pages 261—279), তাহাতে লজ্জায় ঘৃণায় মানুষের এই তথাকথিত সভ্যতাকে নতশির হইতে হয়। শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা কোন কোম্পানী নহে, একাধিক স্বাধীন সভ্য য়ুরোপীয় গভর্ণমেণ্টের এই সব কলঙ্ককর কাজে ভিতরে ভিতরে যোগ এবং সায় আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহার ফলে এক দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ সমগ্র সভ্যতাকে মসীলিপ্ত করিয়াছে। চা-বাগানের (বিশেষতঃ আসামের চা-বাগানের),—কফি ও কোকো-বাগানের, বড় বড় ইক্ষুক্ষেত্রের (জাভা, মরিসাসে), ভারতে নীল চাষের (Indigo plantations) উল্লেখ মনীষী ওয়েলস্ করেন নাই—সর্ব্বত্র এক দারুণ কদর্য্যতা চোখে পড়ে। সে দিন পর্য্যন্ত দাস-ব্যবসায় (slave trade) মানুষকে কি অধম করিয়াছে, তাহার বিবরণ "Uncle Tom's Cabin"-এ পাই। এমন কি, Rockfeller-এর মত জগৎপ্রসিদ্ধ দানশীলও অর্থনীতিক্ষেত্রে, উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে কেরোসিন তৈলের একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপভাবে নীতিজ্ঞানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন, তাহার বিবরণ ওয়েলস্-এর রচনায় পাই।

অর্থের লোভ মানুষকে এমন হৃদয়হীন এবং নীতিজ্ঞানহীন করিয়া তুলে, দেখিলে মনে হয়, কোন পশু বা অসুর যেন মানুষের বেশ ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে ছলে বলে কৌশলে জগতের ভোগসম্ভার আয়ত্ত করিবার জন্য প্রতি যোগিতা করিতেছে। ইহাতে কল্যাণ কাহারও হয় নাই,—ধনী এবং দরিদ্র দুই জনেই মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে। ম্যাক্সিম গোর্কির ভাষায় "The poor people are stupid from poverty and the rich from greed."—The Mother। পূর্ব্বে অনেক মানুষকে নানারকম নির্য্যাতন করিয়া দাসের মত (slave) খাটাইয়া জগতে কতকগুলি লোক ধনী হইতেন; আর এখন অনেক মানুষের বদলে বৈজ্ঞানিক শক্তিপরিচালিত

কলকারখানার সাহায্যে বড়লোক হইবার প্রচেষ্টা দেখি। ফলে দাঁড়াইয়াছে, অর্থনীতিক্ষেত্রে জগতের প্রগতি দুই রকম বেকারের চাপে অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িতেছে। এক দিকে কর্ম্মহীন জগতের উৎপন্ন দ্রব্যক্ষয়কারী বড়লোক বেকার, আর এক দিকে অব্যবস্থাসম্ভূত কর্ম্মহীন এক বিরাট দরিদ্র সম্প্রদায়। দুইএর মাঝে একদল লোক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও তাল ঠিক রাখিতে পারিতেছে না। এইচ, জি, ওয়েলস্ সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন,—

'The Economic World machine is rapidly coming to resemble an unhealthy overgrown body which is accumulating two sorts of unwanted secretion. On the one hand, it has been accumulating the consuming unemployed, a sort of plethora, and on the other, it is developing a morbid mass, a huge tumour now growing very rapidly, of Penniless Unemployed." (Work, Wealth and Happiness of Mankind).

বড় বড় অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে জগতে আজকালের দিনে দারিদ্র্য এবং অভাব মোটেই থাকার কথা নহে।

'Even with known resources, and known methods of exploiting them, the world could certainly maintain several times its present population at much more than its present standard."—Sir Arthur Salter, K.C.B., D.C.L. (Oxon) [Recovery].

মানুষের হাতে যে সমস্ত শক্তি আছে এবং জগতের যে সমস্ত সম্পদ-সম্ভারের সন্ধান মানুষের জানা আছে, তাহাতে জগতের বর্ত্তমান লোক সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতে পারে। শুধু দারুণ লোভের বশে—ভোগের উৎকট মোহে মানুষ কল্যাণদৃষ্টি এবং বিচারবুদ্ধি হারাইয়া এই দুঃখময়

অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু নীতিবিদ্গণের মতে নহে, অর্থনীতিবিদ্-গণের দৃষ্টিতেও মানুষের আজ তাহার সার্থকতার মাপকাঠি বদলাইবার দিন আসিয়াছে। লোভ এবং লাভের মধ্যে (profit motive) সার্থকতা নাই, আছে সমগ্রের কল্যাণবুদ্ধিতে (service motive)। কিন্তু ইহা করিতে হইলে মানুষের অন্তরের রূপান্তর চাই, তাহাকে সত্য দৃষ্টিলাভের সাধনা করিতে হইবে। জগৎকে ঠেকিয়া আজ আবার সেই দীক্ষা লইতে হইবে, 'যেনাহং নামৃতা স্যামস্তেনাহং কিমকুর্য্যাম্।' মুক্তিলাভের জন্য নহে, জগৎকে—ভোগের ক্ষেত্রকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অধ্যাত্ম-সাধনার দীক্ষা দরকার।

কলকারখানা প্রগতির পথে দুইটি বাধা সৃষ্টি করিয়াছে,—একটি বেকার-সমস্যা আর একটি শ্রমিকের জীবনের কদর্য্যতা। কলে দশ জনে দশ হাজার জনের কাজ করিতে পারায় নয় হাজার নয় শত নব্বই জনের বেকার হইয়া পড়ার সমস্যা আসিয়াছে। মনীষিগণ ইহার সমাধান এই ভাবে করিতে চান :—(১) শ্রমিকের কাজের দৈনিক সময় কমাইয়া (যেমন দিন বারো ঘণ্টার বদলে ছয় ঘণ্টা কি চার ঘণ্টা করিয়া) এবং কর্ম্মের বৎসর কমাইয়া (যেমন কুড়ি হইতে চল্লিশ বৎসর কাজ করিবে)। বেশী ছোট বেলায় এবং বুড়া বয়সে কাজ যেন করিতে না হয়। তাহা হইলে আরও অনেক লোকের কাজ বাড়িবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করার পথে দারুণ বাধা। যেমন কোন এক যায়গার কারখানায় এই ব্যবস্থা করিলে আগের মত তেমন লাভ হইবে না বা আগের মত সস্তায় সেই জিনিষ দেওয়া যাইবে না। অন্য যায়গায়ও যদি একই সময়ে এই নিয়ম না প্রবর্ত্তন করা যায়, সেখানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রথম পক্ষের পরাভব ঘটিবে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কলকারখানার কর্ত্তাদের মধ্যে জগৎ-জোড়া সহযোগিতা দরকার। আসল কথা কিন্তু তাহা নহে। কলকারখানার অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে, এক নবযুগের সূচনা,—জগৎ সুখসম্পদে পূর্ণ হইয়া স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া উঠিবে, মানুষ

অল্প পরিশ্রমে তাহার খাওয়াপরার গুরুতর সমস্যা পূরণ করিয়া শিল্পকলা, স্বাস্থ্য ও অন্তররাজ্যের সত্যের অনুশীলন করিবে। জগতের প্রত্যেক লোককে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিতে, স্বাস্থ্যকর সৌন্দর্য্যপূর্ণ ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য করিতে, গ্রাম ও নগরকে অন্তরের আদর্শমত পরিপূর্ণ রূপ দিতে লক্ষ লক্ষ লোকের কি বিপুল কাজ আছে! অথচ সেই সত্যকে ধরিতে না পারায় কর্ম্মের অভাবে দারিদ্র্যের পেষণে লক্ষ লক্ষ লোকের কি হাহাকার!

দ্বিতীয় বাধা শ্রমিকের দুঃখময় জীবন। লোভের বশে শ্রমিককে যত বেশী সম্ভব খাটাইয়া যত কম পারা যায়, মজুরী দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়াইবার প্রচেষ্টায় কর্ত্তারা এই দুরবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। আসল দোষ কলকারখানার নাই। পাশ্চাত্য সভ্য দেশে দুঃখের পেষণে শ্রমিক রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে—ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union) এবং শ্রমিক সঙ্ঘ (Labour Union) প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের ন্যায্য দাবী এমন ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন যে, কর্ত্তারা অধিকাংশ স্থলে সুব্যবস্থা দ্বারা (Scientific Management, Rationalisation) এই সমস্যার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রমিকগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও ভাল বাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা, উপযুক্ত বেতন, পরিমিত শ্রম প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং সর্ব্বোপরি লাভের একটা অংশ (profit sharing) শ্রমিক কর্ম্মচারিগণকে দিয়া কারখানা নিজের মত করিয়া দেখিয়া তাহারা যাহাতে ভাল ভাবে পরিচালনার সহায় হয়, তাহার ব্যবস্থা, এবং research বা অনুসন্ধানী কুশলী দৃষ্টি প্রত্যেক ব্যাপারে দিয়া প্রত্যেকে যাহাতে উন্নতি করিতে প্রয়াসী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার ভাল ভাল কারখানাগুলি প্রগতির পথের এই অন্তরায় দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও অনেক বাকী। সকলের সহযোগিতা বিনা ইহা ঘটিতেছে না; প্রতিযোগিতা এখানেও দারুণ বাধা। এখানেও দরকার সমস্ত জগতের কারখানার মালিকদের একমত হইয়া যতদূর পারা যায়, উন্নত প্রণালীর (Rationalisation বা Scientific Management) রূপ দেওয়া।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও দেখি, কঠোর প্রতিযোগিতা এবং স্বার্থবুদ্ধি প্রগতির পথে দারুণ বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই প্রতিযোগিতা এত দিন ভালই করিয়াছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধির পথে ইহা সীমারেখা (limit) টানিয়া দিয়াছিল। প্রতিযোগিতার জন্যই ব্যবসায়ী তাঁহার ইচ্ছামত লাভ করিতে পারেন নাই,—জিনিষের দাম যথেচ্ছ বাড়াইতে পারেন নাই। এই প্রতিযোগিতাই শেষে এমন অবস্থা সৃষ্টি করিল যে, এক দিকে শ্রমিকের জীবন, সস্তার সৃষ্টি করিতে গিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, আর অন্য দিকে জাতিতে জাতিতে নিজের নিজের দেশে রক্ষণশুল্কের (protective tariff) প্রাচীর তুলিয়া পরস্পরের প্রতিযোগিতার হাত বাঁচাইতে গিয়া বাণিজ্যকে অচল করিয়া তুলিতে লাগিল। পরস্পরের সহযোগিতা এবং সম্পদের আদান-প্রদানেই জগৎ সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হইতে পারে। রক্ষণশুল্ক দ্বারা নিজের নিজের পাতে ঝোল টানিতে গিয়া মঙ্গল হয় নাই কাহারও। ইহা শুধু দুই-এক জন অর্থনীতিবিদের মত নহে,—গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে যে World Economic Conference বসিয়াছিল, তাহারই মত।

"The World Economic Conference of 1927 was composed of some two hundred persons of every kind of relevent qualifications in business, in agriculture, in official life and so on, nominated by fifty Governments; and they agreed unanimously that the chief impediment to the growth of the world's prosperity was to be found in its tariff policies."—Recovery by Sir Arthur Saltar.

কিন্তু শুধু বলিলেই ত আর হয় না। ইহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সমস্ত দেশের সহযোগিতা পূর্ণ মাত্রায় দরকার। প্রত্যেক দেশ হইতে নিরপেক্ষ পাকা ব্যবসায়ী এবং অর্থশাস্ত্রবিদ্ কয়েক জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইয়া একটি World Tariff Board করিতে হইবে।

উহারাই শুধু বিচার করিয়া স্থির করিয়া দিবেন, কোন্ দেশে কোন্ শিল্প রক্ষণশুল্কের দ্বারা কতটুকু রক্ষা করিতে হইবে আর কোন্ কোন্ দেশ কোন্ বিষয়ের উৎপাদনে জগৎকে সম্পন্ন করিবেন, তাহারও পরামর্শ দিবেন। প্রতিযোগিতার বদলে এই রকম একটি সুচিন্তিত পরিচালনা-মণ্ডলীর দরকার। মানুষকে এখানে জাগাইতে হইবে, দেশের স্বার্থবোধ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের যায়গায় সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণবোধ, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করার সৎসাহস। এখানেও দেখি, আজ দরকার মানুষের মনের রূপান্তর। অর্থনীতিজ্ঞের ভাষায়—

"To face the troubles that beset us, the apprehensive and defensive world needs now above all the qualities it seems for the moment to have abandoned—Courage and Magnanimity."—Recovery.

একটি বিষয়ে দেখি, উন্নতিশীল দেশগুলি ভাল ব্যবস্থা করিতেছেন "Investment Trusts" গড়িয়া। বেমক্কা এবং বেপরোয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত লিমিটেড কোম্পানীতে এবং ফাঁকীদার লোকের হাতে অনেক লোকের সঞ্চিত অর্থ এবং দেশের সম্পদ অকারণ নষ্ট হয় দেখিয়া জগতের প্রগতির এই অন্তরায় দূর করিবার জন্য অনেক দেশে অভিজ্ঞ পারদর্শী এবং সাধু (honest) মনীষিগণের দ্বারা গঠিত একটি করিয়া পরামর্শ-সভার (Investment Trust) পরিকল্পনা উন্নতিশীল সকল দেশেই হইতেছে। দেশের লোক সঞ্চিত অর্থ তাঁহাদের হাতে বিভিন্ন অর্থকর-সম্পদ সৃষ্টির কাজে খাটাইবার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

দেশের মুদ্রাবিনিময়ের হার (Exchange) অনেক সময় এমন ইতরবিশেষ হয় যে, tariff বা রক্ষণশুল্কের মত এখানেও বাণিজ্যের অবাধ বিস্তারে দারুণ বাধার সৃষ্টি হয়। মনীষিগণ এই বাধার প্রতীকারের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank এবং Central

Bank) এর পরিকল্পনা করিতেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা মূলনীতি না হইলে উদ্ধার নাই। স্বর্ণমান (Gold Standard) এবং সমর-ঋণের (War debts & Reparations) সমস্যার কথা আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে সর্ব্বত্রই দেখি একই কথা, প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা এবং জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থলে সমগ্রের কল্যাণবুদ্ধি জাগানই ব্যবসায়ের এই দুরবস্থার আসল প্রতীকার। সম্মিলিতভাবে জগতের সমস্যার একসঙ্গে প্রতীকারের উপায় সকলকে দেখিতে হইবে।

বিগত মহাযুদ্ধের পর সকল দেশেই এক দল লোক বর্ত্তমান যুদ্ধের ভীষণতা বুঝিতে পারেন। জগৎকে সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য জাতিসঙ্ঘ বা League of Nations-এর পরিকল্পনা হয়। সকল জাতির বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণের একটি স্থায়ী সভা গঠিত করিয়া বিচার করিয়া আপোশে পরস্পরের বিবাদ মিটাইবার ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে পরে দুইটি আরও একটু কার্য্যকর ব্যবস্থা কয়েকটি প্রধানশক্তি মিলিয়া করেন—লোকার্ণো চুক্তি (১৯২৫) এবং কেল্লগ প্যাক্ট (১৯২৮)। কিন্তু মানুষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ত এখনও হয় নাই। মানুষ এখনও তাহার পশুস্তরের সংস্কার ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। শান্তির বাঁধাবুলির আড়ালে তাই আজ সকল জাতির শাণিত কৃপাণ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, আন্তরিক কল্যাণবুদ্ধি, ন্যায়বিচার এবং উদারতা অপেক্ষা প্রত্যেক জাতিই সমর-সম্ভার (Armaments) এবং কূটনীতি (Policy) এবং জোটপাকানের (Alliances) উপরই ভিতরে ভিতরে ষোল আনা বিশ্বাসী। অথচ সকলেই মনে মনে বুঝিতেছেন যে, এই ক্রমবর্দ্ধমান সমর-সম্ভার এবং সৈন্যদল দেশের এবং জগতের আর্থিক প্রগতির পথে কি দারুণ অন্তরায়। জগতে এক দিন হয় ত জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধের সার্থকতা ছিল বৈশিষ্ট্য এবং বীরত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে, রাজনৈতিক প্রতিভার জন্ম দিতে, উদ্ভাবনীশক্তিকে তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতে

হয় ত কোন দিন ইহাদের জগতের প্রগতির পথে একটা স্থান ছিল; কিন্তু আজ ভীষণতায়—বর্ব্বরতায়—সর্ব্বধ্বংসী নগ্নতায় যুদ্ধ যে প্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, তাহা সকল দেশের মনীষিগণ বুঝিতে পারিতেছেন। জগৎ হইতে যদি যুদ্ধ উঠাইয়া দিতে পারা যায়, তবে সকল দেশের বিরাট সৈন্যবাহিনীকে এবং সমর-সম্ভার গঠনের কারখানাগুলিকে সম্পদসৃষ্টির কাজে লাগান যাইতে পারে এবং সেই বিপুল সম্পদে জগতের যত কিছু অভাব দূর হইতে পারে। যুদ্ধের জন্য বাধ্য করিয়া সৈনিক হওয়ার (conscription) বদলে যদি দেশকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার কাজে দেশের সমস্ত সমর্থ যুবককে দুই তিন বৎসর কি পাচ বৎসরকাল খাটিবার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা (civil conscription) করা যায়, তবে জগতে কি না হইতে পারে? সকল দেশ ভরিয়া সুশিক্ষিত সমাজ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, সুন্দর রাস্তা, বাড়ীঘর, ক্লাব বা আনন্দনিকেতন, সৌধ-মন্দির, শিল্পকলা প্রভৃতি মানুষের যত কিছু উচ্চ প্রেরণা রূপ লইতে পারে।

"It is within the power of those now in adult life to secure that, for the first time in human history, man will be free to build his civilisation without either the crushing burdens of armaments or shattering interruption of war."—Recovery.

সবই হইতে পারে, কিন্তু কথা, কেমন করিয়া হইবে? শান্তির জন্য রচা 'pact' কোনমতেই fact হইয়া উঠিতেছে না। মানুষের অন্তর-লোকে তাহার অবচেতনায় কোন্ উচ্চলোকের প্রেরণা,—একটি আদর্শের আলোকধারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে: পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার প্রেরণা ইহাতে আছে। ইহারই প্রেরণায় মানুষ বিশ্বরাষ্ট্রের (World State) ও যুদ্ধবিরতির উপায় খুঁজিতেছে। এই আদর্শ সার্থক হইয়া উঠিবে তখন—যখন সত্যদৃষ্টি তাহার সমস্ত আধারকে এক দিব্যজীবনে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবে।

জগতে এক নূতন যুগের সূচনা দেখা যাইতেছে। এত দিন যে পথে মানবের প্রগতি চলিয়াছিল, আজ আর সেই সব পথে তাহার উন্নতি সম্ভব নহে। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা (competition) এবং রক্ষণশুল্ক (tariff), কলকারখানায় লাভের নীতি (profit motive), রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ (nationalism) এবং যুদ্ধ (war) মানুষকে আর পথ দেখাইতে পারিতেছে না। ক্ষুদ্রতার মধ্যে যাহার ছিল সার্থকতা, বৃহত্তের ক্ষেত্রে তাহা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাধা। সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন অজেয় শক্তিশালী নূতন এক প্রতিভার আলোকে মানুষ গড়িবে বিশ্বরাষ্ট্র (World State),—সকল সম্পদে সম্পন্ন করিয়া তুলিবে এই পৃথিবী,—তাহারই পূর্ব্বাভাস মনীষিগণের অন্তরলোকে পৌঁছিয়াছে। রেল, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ, বেতার প্রভৃতি মানুষের শক্তিসাধনার ফল এই আদর্শকে রূপ দেওয়ার পথের বাহিরের বাধা (physical obstruction) ঘুচাইয়াছে ; এখন অন্তরের পরিবর্ত্তনের জন্য মানুষকে করিতে হইবে সত্যদৃষ্টিলাভের সাধনা।

মানুষ যখন সংস্কারের গণ্ডী ছাড়াইয়া জ্ঞানের আলোকে চলিতে শিখিবে, তখন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে, এক অন্তরের ঐক্য অনুভব করিবে। এমন কি, তাহার সীমাবদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার যাহা এত দিন তাহার সমাজগত সাধনাগত বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল, তাহাও আর ঐ বিরাট ঐক্যদৃষ্টির পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। এখনই সকল ধর্ম্মের মধ্যে এমন কতকগুলি চিন্তাশীল মনীষী দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান বা যে কোন ধর্ম্মের গণ্ডীতে তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন নাই। যে সত্য দৃষ্টি মানুষকে বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের প্রেরণা দিতেছে, তাহাই কালে সমগ্র মানবকে বিরাট ধর্ম্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রে মিলিত করিবে। ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও গণ্ডী এখনই প্রগতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নারী ও পুরুষের বর্ত্তমান সম্বন্ধ যে প্রগতির প্রধান বাধা, তাহা এখনও মানুষের দৃষ্টিতে ভাল করিয়া ধরা পড়ে নাই। শুধু জনকতক উচ্চ প্রতিভাশালী কবি ও শিল্পীর মানসলোকে মাঝে মাঝে নরনারীর সেই মোহহীন মিলনের নিবিড় আনন্দময় একটি মহিমান্বিত চিত্র ফুটিয়া উঠে। কিন্তু এখনও মানুষকে পশুস্তরের সংস্কার এবং নীচের প্রকৃতির আকর্ষণ এমন মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে, সেই উচ্চতর আদর্শের আলোক পৃথিবীর বুকে কিছুতেই রূপ লইতে পারিতেছে না। প্রকৃতি কিন্তু ভীষণ দুরারোগ্য রোগের অস্ত্রে মানুষকে বার বার তাহার অসংযমের উদ্দাম লালসা ও ব্যভিচারকে সাবধান করেন। তবু মানুষের চৈতন্য নাই। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে দুর্ব্বল ও কুৎসিতের—স্বাস্থ্য, আয়ু, কর্ম্মশক্তি ও আনন্দ হারাইয়া যুগের পর যুগ মানবসমাজ পঙ্গু ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া আছে। পেটেণ্ট ঔষধসেবী নির্বীর্য্য জড়ের দলকে দেখিয়া মানুষের বিপুল সম্ভাবনীয়তার কথা আর মনে আসে না। নারী ও পুরুষ তাহাদের সত্যকার সম্বন্ধকে ধরিতে না পারিয়া প্রগতির পথে এই দারুণ হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছে। আবার প্রতিক্রিয়ায় যখনই পরস্পরকে বিভীষিকার মত দেখিয়া জোর করিয়া বিচ্ছেদরেখা টানিয়া মানুষ এই সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপের খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় এবং বৌদ্ধ যুগের ভিক্ষু ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের জীবনের ব্যর্থতা ইহার দৃষ্টান্ত।

নারী ও পুরুষের সৃষ্টি দুই জনে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার জন্য নহে। নারী ও পুরুষের মিলনে আছে একটা আনন্দ—উৎকট তীব্র আনন্দ; সেই আনন্দকে শুদ্ধ ও রূপান্তরিত করিয়া উচ্চতর বিকাশের পথে লইয়া যাইবার সাধনা উভয়ে করিবে, ইহাই সৃষ্টির নিগূঢ় উদ্দেশ্য। দেহের ভোগের যে আনন্দ, তাহা অতি নিম্নস্তরের,—পশুস্তরের তীব্রতা (acuteness) অস্থায়িত্ব ও অবসাদে জড়িত। মানসিক বৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনুভূতিতে নারী ও পুরুষের মিলনের আরও উচ্চতর

স্তরের আনন্দবোধ জাগিয়াছে। তাহার বিকাশ এখনও ভাল করিয়া হয় নাই, তাই নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ এখনও প্রগতির পথে দারুণ অন্তরায় হইয়া আছে। নীচের স্তর হইতে আনন্দ ও বিকাশের ধারাকে ক্রমে স্থূলের ও দেহবাদের কদর্য্যতার ও অবসাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া নরনারীর সাধনা ফুটাইয়া তুলিবে মিলনের এক পবিত্র অবসাদহীন স্বর্গীয় আনন্দধারা—যাহা সৌন্দর্য্য ও শক্তির প্রকাশে মানবজীবন মহিমান্বিত করিবে। নরনারী উভয়ে যখন এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবনের পথে চলিবেন,—সংযম ও সাধনায় জীবনখানি পূত করিয়া স্বর্গের অমৃত-ধারাকে নামাইয়া আনিতে চাহিবেন,—তখন অপূর্ব্ব শ্রদ্ধানত দৃষ্টিতে একে অপরকে দেখিবেন,—পুরুষের মাঝে নারী দেখিবেন তাঁহার হৃদয়-দেবতাকে, আর নারীর মাঝে পুরুষ দেখিবেন মহিমময়ী কল্যাণময়ী দেবীকে। তাঁহাদের সেই মিলন ভবিষ্যতের বিরাট সৃষ্টিকে জন্ম দিবে।

আদর্শ ও জগৎ

উপরে আকাশভরা চন্দ্র তারকার জ্যোতিঃ, আর নীচে চলিয়াছে অগণিত মানুষের স্রোত। ইহার মাঝে জানি না কখন, কেমন করিয়া আসিয়াছি আমরা কোন্ খেলা খেলিতে। কোন্ সে শিল্পী ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমাদের বাসনার রক্তকমল দোলাইতেছেন, আর তাহার রক্তরাগ ছড়াইয়া পড়িতেছে জীবনের বিচিত্র ছন্দে!

প্রকৃতির এই অধীনতার বিরুদ্ধে মানুষ কিন্তু মাঝে মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেদান্ত কেশরীর নয়ন হইতে একদিন জ্ঞানের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া প্রকৃতির সকল প্রয়াস যেন দগ্ধ করিতে চাহিতেছিল। বুদ্ধ, শঙ্কর, যীশুখ্রীষ্ট প্রকৃতির সকল আকর্ষণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মানবকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন আত্মার মুক্ত চৈতন্যে।

কিন্তু যাহার তরঙ্গ সংঘাতে জগতের পর জগৎ ভাঙ্গাগড়া হইতেছে, কত সভ্যতার পর সভ্যতা সৃষ্টি করিয়া যাহা চলিয়াছে অপ্রতিহত গতিতে, সৃষ্টির এই প্রেরণা আসিতেছে যে উৎস হইতে তাহা সত্যের। মানব ইহাকে ব্যর্থ করিতে পারে নাই, পারিবে না। মানব তাহারই বুকে যেন এক অনবদ্য সৃষ্টি।

এতদিন জড়জগতে, জীবজগতে, পশুজগতে যে একটানা অন্ধ প্রবৃত্তির স্রোত চলিয়াছিল, তাহা মানুষের মাঝে যেন থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানুষ চাহিতেছে জানিতে, জয় করিতে ইহাকে। মূক বিস্ময়ে সে কখন চাহিয়াছে এই বিচিত্র সৃষ্টির পানে; কখন বা অস্তগামী সূর্য্যের অবর্ণনীয় বর্ণচ্ছটা, চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণধারা শান্ত বন, প্রান্তর বা ধ্যানমৌন গিরিশিরে নামিয়া আসিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ মানবকে লইয়া চলিয়াছে কোন্ স্বপ্নলোকে, কখন বা জীবনের বিচিত্র আনন্দে বিভোর হইয়া সে গাহিয়াছে কত গান, রচিয়াছে কত কাব্য, গাঁথিয়াছে কত গল্প।

আবার অনুসন্ধিৎসু তাহার মন বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ করিয়া চলিয়াছে প্রকৃতির এই রহস্যকে। রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক বিবিধ প্রচেষ্টায় উদ্ঘাটিত করিতে চাহিতেছেন, মানুষের কাজে লাগাইতে চাহিতেছেন এই প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত শক্তিকে। স্থূলের বিশ্লেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞানের গতি চলিয়াছে সূক্ষ্মের দিকে। এখানেও দেখি, যতই মানুষ চলিতেছে সূক্ষ্মের দিকে, ততই সে পরিচয় লাভ করিতেছে শক্তির নিবিড়তর সূক্ষ্মতর স্পর্শের সহিত। বাষ্পীয় শক্তি, পেট্রোলের শক্তির পর সে পাইয়াছে বিদ্যুতের শক্তি; তারপর তাহার দৃষ্টিতে আসিতেছে অণু-পরমাণুর অন্তরে বিধৃত এক নিবিড় বিপুল শক্তি (Electron, ও Proton.)।

শরীর-তত্ত্ববিৎ চিকিৎসক আজ বিশ্লেষণ করিতে করিতে শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বতঃস্রাবী গ্রন্থির (Endocrines ও Hormones) বিচিত্র ক্রিয়া দেখিতেছেন, রোগের হেতু জীবাণু-জগতের সূক্ষ্মগতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যতই সূক্ষ্মের দিকে দৃষ্টি অগ্রসর হইতেছে, চিকিৎসক মানব লাভ করিতেছে শক্তির গভীরতর স্পর্শ। মহাত্মা হানিম্যান ঋষির দৃষ্টিতে একদিন এক্ষেত্রে শক্তির যে সূক্ষ্ম রূপকে কাজে লাগাইয়া গিয়াছেন, তাহা আজও সকলের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া আছে।

সকল ক্ষেত্রেই মানবের সাধনা, তাহার অন্তরের আদর্শ করিয়া তুলিতেছে তাহাকে সূক্ষ্মতর গভীরতর পুণ্যালোকের পূজারী। শুধু বাহিরের হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা বা স্থূল ঘটনাকে রূপ দেওয়াতেই তাহার সাহিত্য, শিল্প পর্য্যবসিত হয় নাই। এখানেও সে তাহার সাধনাপূত দৃষ্টি লইয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছে জীবনের অন্তরালে অবস্থিত আদর্শের আলোক,—কমনীয় কোমল গভীর নিবিড় অব্যক্ত এক সৌন্দর্য্যের আনন্দের স্পর্শ জাগাইয়া তুলিতেছে এই দ্বন্দ্বময় জীবনের মাঝে।

একদল লোক আছেন, যাঁহারা আদর্শের আলোক, সূক্ষ্মের দিকে মানবের এই গতিকে হেঁয়ালীর মত দেখেন। সংযম ও সাধনায় সূক্ষ্মের

স্পর্শে আদর্শের আলোকে চলাকে তাঁহারা জগতের স্বচ্ছন্দ গতির বাধা মনে করেন। জীবনকে তাঁহারা চালাইতে চান সহজ প্রেরণার বশে; সহজ প্রবৃত্তি ধারা যেমন ফুটিতে চাহিতেছে জীবনে, তাহাকেই রূপ দিতে দিতে চলাই যেন আসল জীবন। এই জীবন ফেলে 'এক অনির্দ্দেশ্য হেঁয়ালীর দিকে তাকিয়ে থাকাটা কিছু নয়'। 'হেসে লও দু'দিন বইতো নয়',—ফুলের মত এই জীবন ফুটতে না ফুটতে শুকিয়ে যায়, হেলায় হারিও না, লুটে লও এর মধু ত্বরা করি—ওগো যায় চলে যায়, সংযমের বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখো না ইহাকে। বাস্তবকে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে বসে বসে যেন হারিও না। বাহিরের এই বিচিত্র হাসিকান্নামাখা মধু ফেলে অন্তরের অন্ধকার গুহায় কোন্ পরশমণি খুঁজে বেড়াও তুমি? একবার চেয়ে দেখ, প্রকৃতিরাণী তোমার চারিদিকে কত সব ভোগের আয়োজন করে রেখেছেন, তোমার মাঝে কত ক্ষুধা জাগিয়ে, ঐ দেখ ডাকৃচেন যেন—'বেলা যায়, এ সাজান সম্ভার ব্যর্থ করো না।' কি শক্তিময় আহ্বান তাঁর—যার আকর্ষণ মানুষকে বিহ্বল করে নিয়ে চলেছে এই বিচিত্র আয়োজনের মাঝে।

আদর্শবাদের বিরোধী হইয়া তাই সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, কর্ম্মী, রাষ্ট্রনৈতিকের একদল লোক প্রকৃতির এই আকর্ষণের জয়গান গাহিতেছেন। নগ্ন কামনার চিত্র এঁকে যোগাতে চান সাহিত্যিক-কবি-শিল্পী প্রকৃতি চালিত এই মনের খোরাক। ছলে বলে কৌশলে সকলের কাড়াকাড়ি হইতে ভোগ-সম্ভার হস্তগত করিয়া কর্ম্মশক্তির সার্থকতা খুঁজিতেছেন এই অন্ধ ভোগের আকর্ষণে বিহ্বল কর্ম্মীর দল। এই ভোগ-সম্ভারের বণ্টনে যাহাতে ভাগ ঠিকমত হয়, এই লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন রাষ্ট্রনৈতিক বস্তুতন্ত্রবাদী।

এই বস্তুতান্ত্রিকতা (realism) বা স্থূল ভোগবাদের ধারা মানুষকে চাহিতেছে পঙ্গু করিতে, ইহা তাহার অগ্রগতির বাধা। মানুষের মাঝে আছে বিপুল সম্ভাবনীয়তা,—তাহার মাঝে লুকাইয়া আছেন অতি মানব

বা দেব মানব। সহজ ভোগের লীলা-বিলাসে ভুলিয়া থাকিবার পাত্র মানুষ নয়। এই কি তার ললাটের লেখা যে, সে একটি রহস্যাচ্ছন্ন শক্তির হস্তে চিরদিন ক্রীড়নক হইয়া থাকিবে, আর বেদনাপ্লুত ব্যর্থ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে চাহিবে ইহার ভীম অপ্রতিহত গতির দিকে? অন্তরের এই দীনতা * মানবকে যুগে যুগে ব্যথিত করিয়াছে। শুধু একটানা ভোগধারার মাঝে মানুষ যখনই নিজের অন্তরের মহান্ আদর্শকে ভুলিতে চাহিয়াছে, দারুণ অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহার সেই সঙ্কীর্ণ জীবন-গতি,— তাহার সেই ক্ষণস্থায়ী সভ্যতা তুবড়ীর মত, হাউইএর মত জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গিয়াছে।

অন্তরে তাহার অসীমের স্পর্শ, আনন্দোজ্জ্বল নয়নে তাহার ঋষির দৃষ্টি, ললাটে তাহার প্রতিভার আলোক, ওষ্ঠে তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বাহুতে বিপুল শক্তি—মানুষ চলিয়াছে এক বিশাল জয়-যাত্রার পথে। জীবনের ভোগসুখ কতবার তাহাকে পথ ভুলাইয়াছে কিন্তু মুছিয়া দিতে পারে নাই তাহার অন্তর হইতে জীবনের লক্ষ্য। সাধনায়, সংযমে সে জীবনখানিকে পূত করিয়া লইয়াছে, আদর্শের আলোক ধারায় জীবনের পুঞ্জীভূত তমোরাশি দূর করিয়া আনন্দে, সৌন্দর্য্যে, অপ্রতিহত কর্ম্মে জীবনখানি আবার পূর্ণ করিয়া সে নামাইতে চাহিয়াছে স্বর্গের অমৃত। ক্ষুদ্রতার কোলাহলে কাণ না দিয়া আমরা শুনি যেন আদর্শের মঙ্গল শঙ্খ নিনাদ—যাহা কল্যাণের পথে, আনন্দের পথে, অমৃতের পথে মানবকে সতত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের জীবনে মিশিয়াছে সৃষ্টির দুইটী ধারা। একটী প্রবৃত্তির বা সৃষ্টির সহজ প্রেরণা জীবজগতের অপর প্রাণীদের মত বশীভূত করিয়া চালাইতে চাহিতেছে মানুষকে অন্ধ গতিতে। আর একটী হইতেছে

---

* কবি Wordsworth যাহাকে বলিয়াছেন—

"Blank misgivings of a creature
Moving about in worlds not realised."

একটী উচ্চ মহান আদর্শের আলোক, যাহা মানুষের অন্তরের কোন গোপন উৎস হইতে বাহির হইয়া মানুষের এই সহজ-প্রবৃত্তি-মলিন জীবনধারাকে রূপান্তরিত করিয়া সৃষ্টি করিতেছে নব নব সভ্যতা, মানুষকে করিয়া তুলিতেছে সত্য, সৌন্দর্য্য ও শক্তির পূজারী। যিনি ঋষি দৃষ্টিতে জীবাণু জগতের অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগতের মহান্ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই ফরাসী বৈজ্ঞানিক মনীষী পাস্তুর (Pasteur) সত্যই বলিয়াছেন,—

"ধন্য সেই জীবন যাঁহার অন্তরে জাগিয়াছে ভগবানের আলো, একটী মহান্ আদর্শ, আর যিনি সেই আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন জীবনে। ("Blessed is he, who carries within himself a God, an ideal, and who obeys it.")। "উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মনং নাত্মানমবসাদয়েৎ"—আত্মার পুণ্যপূত আদর্শের আলোকে নীচের এই অবসাদময় জীবনধারাকে উপরের দিকে তুলিয়া ধরিতে, রূপান্তরিত করিতে গীতায় ভগবান্ স্বয়ং উপদেশ দিয়াছেন। জীবনে আদর্শকে ফুটাইয়া তোলাই যেন হয় আমাদের সকলের সাধনা।

আদর্শের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। কোন উচ্চলোকের প্রেরণা অন্তরের গোপন উৎস হইতে নিঃসারিত হইয়া বিচিত্র ছন্দে ঝঙ্কৃত করিতেছে বিভিন্ন জীবনকে,—সূর্য্যের আলোকের মত নানাবর্ণে রাঙ্গাইয়া তুলিতেছে বিভিন্ন আধারকে। নীচের মলিনতায়, শুধু প্রবৃত্তির ধারাতে জীবনখানিকে ঢাকিয়া ফেলিতে না দিয়া সংযম, নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও শিক্ষায় জীবনকে ভরাইয়া তুলিতে তুলিতে দেখা দিবে জীবনে আদর্শের আলোক। সেই আলোকে পথ চিনিয়া চলিলে জীবনে আবার নামিয়া আসিবে স্বর্গের অমৃত।

পরিশিষ্ট

[আজকাল বাংলায় অর্থনীতি বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ ও বই বাহির হইতেছে। সে সকল আমাদের সকলেরই পড়া ও আলোচনা করা দরকার। পরিশিষ্টে তিন জন বিজ্ঞ মনীষীর লিখিত প্রবন্ধ হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অমলজ্ঞানের আলোকপাতে আমাদের অর্থসমস্যার জটিল পথ উজ্জ্বল হইবে।]

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

ডাঃ এইচ্ এল্ দের অভিমত

(ক)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমিতির এক সভায় বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ডের অন্যতম সভ্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শাস্ত্রের ধ্যাপক ডাঃ এইচ এল দে, ডি এস সি, (ইকন) [লণ্ডন] মহাশয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাটের মূল্য বৃদ্ধির উপর যে বাঙ্গলা দেশের শিল্প, বাণিজ্য, সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গীণ আর্থিক তথা সামাজিক ও রাজনীতিক উন্নতি নির্ভর করে তাহা বিশদরূপে দেখাইয়া, তিনি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত ত্রৈবার্ষিক পরিকল্পনা প্রদান করেন।

সংক্ষেপে তাহা এইরূপ ঃ—প্রথম বৎসর—যে পঞ্চাশ হাজার গ্রামে পাট চাষ হয়, সেই গ্রামগুলিতে দশ হাজার পাটচাষ সমিতি স্থাপিত হইবে। দশটী সমিতির উপদেশক, পরামর্শদাতা ও পরিচালকরূপে প্রাদেশিক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটীর অধীনে ৫০-৫-৭৫ টাকা বেতনে এক একজন কর্ম্মচারী থাকিবেন। প্রত্যেক কৃষক প্রতি বৎসর কত জমিতে পাট বুনিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বাৎসরিক লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং উক্ত নির্দ্দেশ অবহেলা করিলে দোষী কৃষককে সামান্য পরিমাণে জরিমানা করা হইবে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া লাইসেন্স দিবার এবং জরিমানা করিবার ক্ষমতা পাটচাষ সমিতির হস্তে অর্পণ করা হইবে। প্রত্যেক বিভাগ, জিলা, থানা, গ্রাম এবং কৃষক কোন্ বৎসর কি পরিমাণ জমিতে পাট বপন করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে প্রাদেশিক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কমিটি। দ্বিতীয় বৎসর নানা স্থানে বহু সংখ্যক সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্ত পাটগোলা স্থাপন

করা হইবে। তৃতীয় বৎসর—উপরি উক্ত দুই প্রণালীতে সম্পূর্ণ সুফল না ফলিলে প্রাদেশিক কমিটি পাট ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, ডাঃ দের প্রস্তাবের মূলসূত্র হইতেছে আইনগত বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ। উক্ত ব্যবস্থার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য চটকলের মালিক এবং রপ্তানীকারীদের নিকট হইতে প্রতি মণে এক আনা করিয়া ট্যাক্স আদায়, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচ লাখ টাকা সাহায্য আদায় এবং প্রত্যেক পাট চাষী হইতে বাৎসরিক আট আনা করিয়া লাইসেন্স ফিস—এই তিন প্রণালীতে বার্ষিক প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা উঠাইতে পারা যাইবে, অনুমান করা যায়। পাটের পরিবর্ত্তে কি ফসল জন্মান যায়, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি বর্ত্তমানে আমরা পাটের জমি শতকরা ২০ ভাগ কমাই, তাহাতে মোট ৪,৫০,০০০ একার জমি পাট মুক্ত হইবে। ১০০,০০০ একার জমিতে আকের চাষ করা যায়। ৭০০,০০০ একার পরিমাণ পাটের জমিতে প্রতি বৎসর পাট না জন্মাইয়া যদি এক বৎসর পাট এবং অন্য বৎসর ধান্য জন্মান যায়, তাহাতে পাটের জমির পরিমাণ কমিবে ৩,৫০,০০০ একার এবং ধান্যের জমি বাড়িবে ৩,৫০,০০০ একার। বর্ত্তমানে ধান্য ও পাটের মূল্য যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, পাটের পরিবর্ত্তে ধান্যের চাষ করিলে তাহাতে কৃষকদের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। অধিকাংশ প্রতিবৎসর একই জমিতে পাট জন্মানর ফলে জমির উর্ব্বরতা হ্রাসের দরুণ যে নিকৃষ্টতর পাট হয়, তাহা হইবে না। অন্যদিকে, ৩,৫০,০০০ একার জমিতে উৎকৃষ্ট ধান্যবীজ বপন করিয়া ধান্যচাষের খরচ কমাইতে পারিলে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের আমদানী বন্ধ করিতে পারা যাইবে এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালীর আবশ্যক ধান্য বাঙ্গলাদেশ হইতে সরবরাহ করা যাইবে।

(খ)

এই সম্বন্ধে ডাঃ দে আরও বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য হইলে, তাহাতে অন্ততঃ একসহস্র শিক্ষিত যুবকের কর্ম্মসংস্থান হইবে।

এইরূপ প্রণালীতে কৃষক ও কারিকরদের কৃষি, শিল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতির প্রচেষ্টার ব্যবস্থার সঙ্গে তাহাদের পরিচালক ও পরামর্শদাতারূপে শিক্ষিত যুবকদের কর্ম্মসংস্থান ব্যবস্থার সংযোগ করিলেই দেশের ভীষণ বেকার সমস্যার যথোপযোগী সমাধান হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। ইহাতে একদিকে যেমন যুবকদের দেশ-সেবার অদম্য উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, অন্যদিকে তেমনি কৃষক ও কারিকর প্রভৃতি শ্রমজীবীদের কার্য্যক্ষেত্রও প্রসারিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হইবে। বর্ত্তমানে সরকারী শিল্পবিভাগ যে ছুরি, কাঁচি, সাবান, ছাতা নির্ম্মাণ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্যে শিক্ষিত যুবকদের নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা মন্দের ভাল হইলেও, কোদালি, খন্তা, ছুরি, কাঁচি নির্ম্মাণে লৌহ-ইস্পাতের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবহারের মতনই অনেকটা বিসদৃশ ব্যবস্থা বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। তাহাতে একদিকে যেমন শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষা দীক্ষা উৎসাহ আকাঙ্ক্ষার অপব্যবহার হয়, অন্যদিকে শ্রমজীবী বেকারদের কর্ম্মক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

(গ)

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সাফল্যলাভের পথে নিম্নলিখিত বিঘ্নগুলি আছে বলিয়া ডাঃ দে নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ—উক্ত পরিকল্পনার কোন সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট আকৃতি বা অবয়ব নাই। দ্বিতীয়তঃ—পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার সরকারী, বে-সরকারী বহুবিধ কর্ম্মচারী এবং সঙ্ঘের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল-ভাবে শতধা বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং নিষ্ফলতার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যাইবে না। তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক পাট চাষীরই মনে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ এবং বৃহত্তর স্বার্থের দ্বন্দ্বের কথা আছে, তাহা সরকারী বিবৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি বা আইনগত বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা মিটাইতে পারা যায় কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাতে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। চতুর্থতঃ—কেবলমাত্র উপদেশ ও পরামর্শমূলক কার্য্য-

প্রণালীর বিফলতা গত দুই তিন বৎসরে বাঙ্গলাদেশে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। অন্যান্য দেশেও ইহা কার্য্যকরী হয় নাই। এই সব দোষ থাকা সত্ত্বেও বর্ত্তমান সরকারী পরিকল্পনাকে গন্তব্য পথে প্রথম পাদবিক্ষেপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে এই সঙ্গে সরকার যদি ক্রমবর্দ্ধমান বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও গ্রহণ করেন এবং আবশ্যকানুযায়ী তাহা ব্যবহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সরকারের বর্ত্তমান পরিকল্পনার সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা যায়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'—৯ই আশ্বিন, ১৩৪১

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী

[শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার]

"বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইতেছে না, ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ হইল বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ব্যাপক দৃষ্টি এবং সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যমের অভাব। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এতদিন তাঁহার সঙ্কীর্ণ কর্ম্মকেন্দ্রে বসিয়া যে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। নতুবা পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের সম্ভাবনা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। বর্ত্তমানে সর্ব্বদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে সকল ব্যবসায় শিল্পই পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেছে। এই প্রভাবের প্রগতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে কোন ব্যবসায় শিল্পই এখন আত্মরক্ষায় সক্ষম হইবে না। এই বিশ্বশক্তি এখন নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। একদিকে যেমন উন্নততর শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ইহার প্রকাশ দেখা যাইবে তেমনি বিভিন্ন দেশের শুল্কব্যবস্থা, অর্থ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্য দিয়া ইহার প্রভাব অভিব্যক্ত হইতেছে। যাঁহারা এই বিশ্বশক্তির দৈনন্দিন প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবহিত হইবেন, তাঁহারাই ইহার সংঘাত প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবেন। যাহারা এ বিষয়ে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকিবেন তাহাদের পক্ষে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সংযোগের অভাবে বাঙ্গালীর ব্যবসায় শিল্পে কিরূপ অনর্থ ঘটিতেছে, দুই একটী দৃষ্টান্ত হইতেই আপনারা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আজ মাত্র একমাস কাল পূর্ব্বে ঢাকা শহর নিবাসী এক 'কুশিদা' বস্ত্রব্যবসায়ী কলিকাতায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার নিকটেই আমি প্রথম জানিতে পারি যে, ঢাকায় মাত্র দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বেও

'মসলিন' এবং 'কুশিদা' বস্ত্র বিক্রয় বিশেষ লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ঢাকা শহরের সন্নিকটস্থ গৃহস্থ পরিবারের মহিলাগণ অবসর সময়ে মহাজনের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্ত্রখণ্ডের উপর রেশমী সূতাদ্বারা নক্সা আঁকিয়া এই 'কুশিদা' বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে প্রায় দু-চার হাজার গৃহস্থ পরিবারের অর্থোপার্জ্জনের সহায়তা হইত। দশ-পনর বৎসর পূর্ব্বেও প্রায় তিন-চার লক্ষ টাকার কুশিদা বস্ত্র, জেদ্দা, আল্‌জিরিয়া, টিউনিস্, কনষ্টাণ্টিনোপল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইত। এই রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত ঢাকার ব্যবসায়িগণের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব উৎপন্ন মাল কলিকাতায় অবাঙ্গালী রপ্তানীকারক কোম্পানীর নিকট নগদ মূল্য প্রাপ্তির চুক্তিতে পাঠাইতেন মাত্র। আজ চার-পাচ বৎসরের মধ্যে এই কুশিদা বস্ত্র রপ্তানীর ব্যাপারে ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সর্ব্ব-সমেত রপ্তানীর মূল্য এখন মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ ঢাকার কুশিদা বস্ত্রশিল্প এখন ধ্বংসপ্রায় হইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বিপত্তি নিরাকরণের জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের সহায়তায় কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না তাহাই আলোচনা করিবার জন্য ঢাকানিবাসী এক ব্যবসায়ী মহোদয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিতেছি। কিন্তু এই একটিমাত্র দৃষ্টান্তই বাংলার মফঃস্বলের ব্যবসায়িগণের পক্ষে পরম শিক্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে। আমি ঢাকা শহরের এই কুশিদা ব্যবসায়ীর রপ্তানী বাণিজ্য বিষয়ে অজ্ঞতা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও হতাশ হইয়াছি। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি কয়েকদিন পূর্ব্বে ব্রিটিশ ট্রেড কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, এবং কেন বিগত কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশে 'কুশিদা'র আমদানী হ্রাস পাইয়াছে সে বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, ট্রেড কমিশনার স্পষ্ট জবাব দেন যে, বর্ত্তমান যুগে যে ব্যবসায়ী বিশ্ববাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন থাকিবে, তাহার পক্ষে ইহাই অনিবার্য্য শাস্তি। ঢাকার কুশিদা বস্ত্রের চাহিদা

হ্রাস একদিনে হয় নাই, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। যখনই চাহিদা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই ঢাকার ব্যবসায়িগণ অনুসন্ধান করিতে পারিতেন উহার কারণ কি। যে সকল দেশে মাল রপ্তানী হইত সেখানে শুল্কবৃদ্ধি হইয়াছে, কি, সে দেশের লোকের রুচির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কারণ জানিতে পারিলে নিরাকরণের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়—অন্ততঃ চেষ্টা করা যায়। ব্রিটিশ ট্রেড কমিশনারের উক্তি অর্থহীন নয়।

ইহার পর প্রশ্ন উঠিবে, বিশ্ববাণিজ্যের প্রগতির সহিত বাংলার মফঃস্বলস্থ ব্যবসায়িগণের যোগসূত্র স্থাপনের উপায় কি? আমার মনে হয়, ইহার একমাত্র উপায় ব্যবসায়িগণের সহিত তাহার সংযোগসৃষ্টি। কলিকাতা অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। সেখানেই এই ব্যাপারের সকল তথ্য সংগ্রহ, মতামত প্রকাশ এবং রীতি পদ্ধতির আলোচনা করিবার জন্য ব্যবস্থা ও সুযোগ রহিয়াছে—সুতরাং বাংলার ব্যবসায় শিল্পের প্রসারের উপায় কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়াই করিতে হইবে। বাংলার প্রত্যেক জেলাকে কেন্দ্র করিয়া যদি ব্যবসায়িগণের সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্ঘগুলি যদি কলিকাতায় প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের সহিত সংযোজিত থাকে, তাহা হইলে অনায়াসেই সমগ্র বিশ্বশক্তির সহিত যোগস্থাপন সম্ভব হইতে পারে। প্রতি বৎসর কোন কেন্দ্রস্থানে সমস্ত বাংলাদেশের ব্যবসায়িগণের একটী সম্মিলন করা যায় কিনা, এ বিষয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স চিন্তা করিতেছেন। আমার মনে হয় এরূপ একটী সম্মিলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এখানে নানাস্থানের ব্যবসায়ীরা সমবেত হইয়া পরস্পরের সহিত সম্মিলিত কার্য্যপ্রণালীর আলোচনা করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্কীয় নানারূপ সমস্যার সমাধানেরও চেষ্টা হইতে পারে। বিভিন্নস্থানে নানারূপ রাজনৈতিক সম্মিলনের ফলেই আজ দেশে এরূপ রাজনৈতিক জাগরণ আসিয়াছে। ব্যবসায়ক্ষেত্রেও আমাদের এইরূপ জাগরণ আনিতে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের বর্ত্তমান হীন অবস্থা শীঘ্র নিরাকরণের আশা নাই।

এই প্রকার সংহতি, পরস্পর যোগাযোগ স্থাপনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমি দু-একটী কথা বলিতে চাই। বাংলার মফঃস্বলে এখনও যে শিল্পব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, দেশের অর্থনৈতিক সংস্থানে তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে বিবেচনা করিলে, কৃষির সহিত ইহাদিগকেও মফঃস্বল বাংলার আর্থিক মেরুদণ্ড বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই কারণে ইহার যথাসম্ভব উন্নতি সাধন করিবার জন্য আমাদিগকে কর্ম্মতৎপর হইতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, কাঁসা পিত্তল তামা শিল্পের য়্যালুমিনিয়ামের প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অথচ ঐ সকল ধাতুর উপর কলাই ইলেকট্রো প্লেট করা বা বিভিন্ন আকারের দ্রব্যের চাহিদা এখনও যথেষ্ট আছে। কাঁসারীকে আধুনিক প্রথায় শিক্ষা, কাঁচা মালের ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করিয়া দিলে তাহার বংশগত কলাকৌশলের প্রভাবে সে এখনও তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সংঘাতে ইহাদের রূপ বদলাইবার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু, যে-কোন অবস্থাতেই হউক, এই সকল ব্যবসায় এবং শিল্পকে জীবিত রাখিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। বাংলার কুটীরশিল্পগুলি অনেকস্থলে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই শিল্পগুলিকে উন্নততর পরিচালনপদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। মুখ্যতঃ ইহা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-শিল্প বিভাগের কর্ত্তব্য। কিন্তু অর্থাভাব এবং সম্যক মনোযোগের অভাবে গভর্ণমেণ্টের এই বিভাগ এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিছুকাল পূর্ব্বে বাংলার মফঃস্বলে বিবিধ কুটীরশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা জানিবার উদ্দেশ্যে এই বিভাগে কতিপয় বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও কার্য্যকরী হয় নাই। ফলে বাংলার কুটীরশিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই ধারণা স্পষ্ট ও সঠিক নয় এবং সে বিষয়ে আমরা যাহা বলি তাহা নিতান্তই

অনুমানসাপেক্ষ। যেস্থলে শিল্পবিশেষের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সমস্যা সম্বন্ধেই আমাদের সঠিক ধারণা নাই, সেখানে তাহার উন্নতি সাধন সম্ভব হইতে পারে কি করিয়া? এ বিষয়ে আমার মনে হয় যে, বাংলার শিল্পগুলি যদি আমার পূর্ব্ববর্ণিতরূপ জেলাসঙ্ঘের সহিত সম্মিলিত হয় এবং কলিকাতার কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগ স্থাপন করে, তাহা হইলে নানাপ্রকারে এই শিল্পগুলির সংরক্ষণ এবং উন্নতি সাধন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইতে পারে এবং উক্ত শিল্পের সহায়তা করাও সম্ভবপর হয়।"

'প্রবাসী'—আশ্বিন, ১৩৪০

ব্যাঙ্কিঙের কয়েকটি মূলতত্ত্ব

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, বি-এ, (হারভার্ড)

"সরকারী আর্থিক নীতি এবং ঋণনীতি ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, এমন নীতি অবলম্বন করা হয় যাহা আমাদের পক্ষে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টের কারণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মুদ্রা বিনিময়ের হারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে-সময়ে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও সরকার টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হারে ধার্য্য করিলেন। এই হার বজায় রাখিতে প্রথমতঃ চল্‌তি মুদ্রার সংখ্যা কমান হইল (contraction of currency), দ্বিতীয়তঃ, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় উঁচু রাখা হইল, তৃতীয়তঃ, ট্রেজারী বিল বেশী সুদে বিক্রয় করিয়া টাকার বাজার গরম রাখা হইল। ট্রেজারী বিলের সুদের হার বেশী হওয়াতে কোম্পানীর কাগজের দর কমিয়া গেল, কোম্পানীর কাগজের দর কমিয়া যাওয়াতে বাধ্য হইয়া তৎকালীন নূতন সরকারী ঋণের সুদের হার বাড়াইতে হইল। ১৯৩১ সালে সরকার ৬।০ সুদের ট্রেজারী বণ্ড বিক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে সরকারী ঋণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অথবা কারেন্সী আপিসে ক্রয় করা হইত এবং তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত বিক্রয় করা হইত। ১৯৩১ সনে ট্রেজারী বণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই এবং কোন্ তারিখে ইহার বিক্রয় বন্ধ হইবে, ইহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেটের মত যে-সকল পোষ্ট আপিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের কার্য্য করে তাহাদের মারফতে ইহা ক্রয় করা যাইতে পারিত। তদুপরি সরকারী বিজ্ঞাপনে ইহাও জানান হইয়াছিল যে, এই বণ্ড পোষ্ট আপিসে খরিদ

করিলে এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের একাউণ্টেণ্ট্-জেনারেলের নিকট গচ্ছিত রাখিলে, ইহার উপর আয়কর লাগিবে না। সাধারণতঃ কলিকাতার বড় বড় ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের বার্ষিক সুদের হার শতকরা ৩৷৷০ বা ৪৲ টাকার অধিক নয়, মফস্বলে যদিও সুদের হার উচ্চ তথাপি শতকরা ৬৲ হইতে ৬৷৷০ টাকার বেশী নয়। ইহা নিশ্চিত যে, গভর্ণমেণ্টের তুলনায় কোন ব্যাঙ্কেরই স্থায়িত্ব সুদৃঢ় নয়। কাজেই যদি গভর্ণমেণ্টই ৬৷৷০ টাকা হারে সুদ দেয় তাহা হইলে লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে কেন? সরকার পক্ষের লোকের বিশ্বাস যে, আমাদের দেশের আনাচে-কানাচে অর্থ ছড়াইয়া রহিয়াছে, এইগুলি কুড়াইয়া লইতে পারিলে দেশের ও সরকারের উভয়েরই মঙ্গল। এই বিষয়ে অনেক গবেষণাও হইতেছে এবং বিশেষজ্ঞগণ অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের গুপ্ত (hoarded) ধনের পরিমাণ কত। গুপ্তধন কুড়াইতে গিয়া ব্যাঙ্ক এবং সেই সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কি ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। একে ত আয় কম, কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম; স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর দেশের আস্থার অভাব, তদুপরি ইহাদের সহিত সরকারের তীব্র প্রতিযোগিতা, এইসব সংযোগের কারণে ব্যাঙ্কগুলি যাহা কিছু আমানত পাইত তাহাও তখন প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমানতী টাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইতেই টাকাটা উঠাইয়া তদ্দ্বারা ট্রেজারী বণ্ড ক্রয় করা হইয়াছিল। এইরূপে যদি বেশীর ভাগ আমানতই উঠাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের পক্ষে টিকিয়া থাকাই মুস্কিল। সরকারের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমানতের সুদের হার বাড়াইতে হয়, সেই অনুপাতে ঋণের সুদও বাড়ে। বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী মন্দার ফলে কেনাবেচা কমিয়া গিয়াছে, তদুপরি প্রতিযোগিতা বাড়িয়া মালের মূল্য অসম্ভব হ্রাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় যদি আমাদের মাল উৎপন্নের খরচ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে অন্য দেশের সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিব কি করিয়া? সরকারের যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে,

টাকার বাজারে তাহারা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দাঁড়াইতে দিবেন না, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহারা নিশ্চয়ই সফল হইবেন। লোকসান করিয়া কেহ ব্যবসায় করে না, করিলেও বেশীদিন টিকিতে পারে না, কিন্তু সরকারের সে চিন্তা নাই, একদিকে সুদের হার অন্যদিকে করের ভার দুইটিই একসঙ্গে বাড়িতে পারে।

বাজেট করিবার সময় আয় ব্যয়ের যে অনুমান (estimate) করা হইয়াছিল, প্রকৃত আয়ের পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে। আমদানী পণ্য হ্রাস হওয়ায় আমদানী শুল্ক কমিয়াছে। রেলের আয় কমিয়াছে। এইরূপ সবদিকেই আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, অথচ সেই অনুপাতে ব্যয়ের হ্রাস হয় নাই, ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কয়েকটি কমিটি বসিয়াছিল এবং তাঁহারা ব্যয় সঙ্কোচের জন্য কিছু কিছু পরামর্শও দিয়াছেন, কিন্তু আসলে যেখানে ব্যয় সংক্ষেপ কর্ত্তব্য সেখানে কিছুই করা হয় নাই। বড় চাকুরিয়া এবং ছোট চাকুরিয়া সকলেরই বেতন শতকরা দশ টাকা কমান হইয়াছিল, কেননা, বড়দের খরচ বেশী, অতিরিক্ত কমাইলে চলিবে কেন? লি-কমিশন যে গোদের উপর বিষফোড়া বসাইয়া দিয়াছিল, তাহাও থাকিবে, নচেৎ ইংরেজদের উপর ঘোর অবিচার করা হইবে। সৈন্য-বিভাগের ব্যয় আর হ্রাস করা যায় না, তাহা হইলে শান্তিসুশৃঙ্খলার অসুবিধা হইবে, অর্থাৎ ব্যয় যাহা ছিল তাহা অল্প কাটছাঁট করিয়া পূর্ব্বে যাহা ছিল প্রায় তাহাই থাকিবে। এইরূপ হইলে বাজেটে আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকিবে কি করিয়া? লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন। ভারতে প্রজার উপর আরও কর চাপাও। কর-বৃদ্ধির পদ্ধতিও এইরূপ রাখিতে হইবে যে, তাহাতে বৃটিশ ব্যবসায়ীর হিত যথাসম্ভব বজায় থাকে। আমাদের কিছু বলা সে শুধু অরণ্যে রোদন। যদি আমরা আপত্তি করি কিংবা বিল পাশ না করি তাহা হইলে ভাইস্‌রয়ের সার্টিফাইং ক্ষমতারূপ ব্রহ্মাস্ত্র আছে। সরকারী আর্থিক নীতি,—করনীতি যাহার একটি অঙ্গ তাহা আমরা

দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ঘটনায় উপলব্ধি করি। শুল্কের হার বৃদ্ধি হইলে বিদেশজাত মালপত্র মহার্ঘ হয় এবং স্বল্প আয়ে জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে গিয়া আমাদের বেগ পাইতে হয়। ক্রয়-শক্তি হ্রাস হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য আরও মন্দা হয়, ব্যাঙ্কের আমানত কমিয়া যায় এবং অনেকস্থলে দেয় টাকা আদায়' করা মুস্কিল হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে সরকারী মুদ্রা, * অর্থ এবং ঋণ-নীতির উপর দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও তৎসঙ্গে ব্যাঙ্কের সফলতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এইসব ব্যাপারে আমাদের হাত এখন নামমাত্র আছে। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে আমাদিগকে কতটা অধিকার দেওয়া হইবে বলা যায় না ; তবে গোলটেবিল বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে, এ-বিষয়ে বেশী আশা করা দুরাশা মাত্র।"

'প্রবাসী'—চৈত্র, ১৩৩৯

* [যাঁহারা আমাদের দেশের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে তথ্য জানিতে চান তাহারা ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন মহাশয়ের সুলিখিত প্রবন্ধ "ভারতে মুদ্রানীতি" পড়িবেন। এই জটিল তত্ত্ব অল্প কথায় সরলভাবে বুঝান আছে—লেখক]

অর্থনীতির নীতিতে আমাদের উদাসীনতা

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় ব্যাঙ্ক সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর গোলযোগের খবর বাহির হইয়াছে। অথচ দশ-বার বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপ ব্যাপার বঙ্গের আর একটি মহকুমা সহর কুষ্টিয়ায় ঘটিয়াছিল। তাহার পরেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের যে ব্যাপার সমগ্র বঙ্গে কালো ছায়া বিস্তার করিয়াছিল—তাহার শিক্ষাও যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এই ঘটনায় বুঝা যাইতেছে। অর্থনীতি বিষয়ে আমাদের চিরন্তন উদাসীনতা ত্যাগ করিয়া এই সব ব্যাপার ভাল ভাবে আলোচনা করিয়া তাহার শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া যদি আমরা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান না হই, তবে ব্যর্থতার আঘাত শুধু বর্ত্তমানকেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবে না, ভবিষ্যতে কোন ভাল অর্থপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা একেবারেই অসম্ভব হইবে।

যে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম তাহার প্রত্যেকটীতেই দেখি, যিনি ব্যাঙ্কের কর্ত্তা ছিলেন তিনি সাধারণের অগাধ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়া বহুদিন যাবত (৫।৭ বৎসর তো বটেই) একভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা যে কোন দিন ব্যাঙ্কের অর্থ অপহৃত বা অপব্যয়িত হইতে পারে তাহা কেহ কোনদিন ভাবে নাই। আর যাঁহাদের হাতে হিসাবপত্র দেখার ভার সেই অডিটার মহাশয়গণ এবং অন্যান্য ডিরেক্টরবর্গও কতকটা ব্যক্তিত্বের মোহে কতকটা জাতীয় আলস্য ও ঔদাস্যবশে যথোচিত কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন নাই। শেষে একদিন যখন দেখা গেল ভিতরে ভিতরে সব ফাঁকি তখন আর উপায় নাই। অজস্র অর্থ যাহা সমবেতভাবে নিয়োজিত হইয়া দেশের ও জাতির সম্পদবৃদ্ধি করিত তাহা গেল ব্যক্তির উদরে—ডিপোজিটার যাঁহারা কষ্টার্জ্জিত অর্থ

জমা রাখিয়াছিলেন তাঁহারা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। দুই ক্ষেত্রে কর্ত্তারা গেলেন জেলে, একক্ষেত্রে আত্মহত্যা বা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু। তদন্তের সময় বড় বড় জন কতক ডিপোজিটর (যাঁহারা টাকা জমা দিয়া পাশ বহি লইয়াছেন) যাইয়া দেখেন পাশ বহিতে টাকা জমা থাকিলে কি হয়, আসল খাতায় কিছুই জমা নাই। তাঁহারা সরল বিশ্বাসে ব্যাঙ্কের ছাপ মারা পাশ বহিতে জমা দেখিয়াই এদিকে সন্তুষ্ট। ব্যাপার দুই-এক দিনের নয়; ইহা ধারাবাহিক ভাবেই চলিয়াছিল বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া। অথচ অডিটার অডিট করিয়াছেন, ডিরেক্টরগণ মিটিংও করিয়াছেন। প্রথম বারের দুর্ঘটনার পর দশ-বার বৎসর গিয়াছে অথচ এমন ব্যাপার যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার যথেষ্ট প্রতিকার-সূচক আইন-কানুন ও নীতি (Rules) প্রবর্ত্তিত হইল না। পাশ বই প্রত্যেক অডিটের (হিসাব পরীক্ষার) সময় সমস্তগুলি call করিয়া দেখা এবং ডিরেক্টর মিটিংএর সঙ্গে পাঁচশত টাকার উপর যাঁদের ডিপোজিট আছে এমন সব ডিপোজিটরগণেরও মিটিং করা, এইরূপ পাকাপাকি ব্যবস্থায় এ অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে। আর একটা ব্যাপার ভুয়ো ঋণদান অর্থাৎ একটা উপযুক্ত সম্পত্তিহীন পাত্রে বহু টাকা ঋণ লিখাইয়া দিয়া বা ডিরেক্টরগণের অনুগত আত্মীয়-স্বজনের ভিতর ঐরূপ ঋণ দিয়া ব্যাঙ্কের অর্থের অপব্যয়। এরও প্রতিকার হয় অনেক পরিমাণে যদি ডিরেক্টরগণের সহিত পাঁচশত টাকার উপর যাঁদের ডিপোজিট আছে এমন সব ডিপোজিটরগণ ও বড় সেয়ারারগণ একসঙ্গে একমত না হইলে পাঁচশত টাকার উপর কোন দাদন চলিবেনা এমন ব্যবস্থায়। মোটকথা ডিপোজিটর, ডিরেক্টর ও সেয়ারহোল্ডার সকলেরই যখন স্বার্থ ব্যাঙ্কে জড়িত তখন সকলকেই তাহার সাফল্যের জন্য সমবেতভাবে উদ্যোগী ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কাহারও উপর নির্ভর করিয়া চুপ করিয়া স্বল্পায়াসে অর্থ ও সাফল্য পাইতে গেলেই এই দুর্গতি ঘটিবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলায় ব্যাঙ্কগুলির বর্ত্তমান আর্থিক অসুবিধা হইতে আর একটি শিখিবার কথা উল্লেখ করা যায়। মফঃস্বলের ব্যাঙ্কগুলি বেশীর ভাগই ভূমির উপর (Land mortgage) ঋণ-দান করিয়া এই এক অসুবিধার উদ্ভব করিয়াছেন যে, তাঁহারা ছয়মাস একবৎসর কি বড় জোর দুই বৎসরের মেয়াদে ডিপোজিট লইয়াছেন অথচ সেই টাকা জমীবন্ধকীতে খাটানতে তাহা শীঘ্র সময় মত ঘুরিবার সম্ভাবনা কম হইয়া পড়ায় বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে। যতদিন জিনিষপত্রের দাম বিশেষতঃ পাটের দাম ভাল ছিল জমীবন্ধকী হইতে সুদের টাকা বেশ ঘুরিতেছিল, ডিপোজিটরগণ ঠিকমত সুদ পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। মেয়াদ অন্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার ডিপোজিট নূতন করিয়া (renew) দিতেছিলেন। কিন্তু এখন আজ দুই-তিন বৎসরের আর্থিক সঙ্কটে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে মফঃস্বলের অধিকাংশ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব রক্ষাই সুকঠিন। সমস্ত বিষয় এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের উপযুক্ত রিজার্ভ রাখা দরকার, টাকার কতকটা অংশ ভাল চল্‌তি কারবারে (Businessman-দের মধ্যে) খাটান দরকার। বাংলায় জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গেই শুধু ব্যাঙ্ক যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থাপন করিতে যায় তবে তাহা ব্যাঙ্কের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

যদি আমরা অবহিত হইয়া অর্থনীতির নিয়মমত সুব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক ও লোন অফিশগুলি সত্বর না গড়িয়া তুলি তবে দেশের সম্পদবৃদ্ধির কাজে কোন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়া অসম্ভব হইয়া উঠিবে। শুধু পোষ্টাফিশের সেভিংব্যাঙ্ক আর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেরই শরণ সকলকে লইতে হইবে। বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতি তাহাতে কমিবে না।

আশ্বিন, ১৩৪১।

করিয়া সরল ভাষায় বুঝান আছে। তৎপর প্রত্যেক রোগের পরিচয় এবং মিহিজাম দাতব্য চিকিৎসালয়ের বহু অভিজ্ঞতা-লব্ধ চিকিৎসার কথা—রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ লক্ষণে কি ঔষধ কোন্ শক্তিতে দিতে হইবে তাহা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ইহাতে সকলেই ঘরে বসিয়া চিকিৎসা করিতে পারিবেন মনে হয়।"

—বিজলী

* * *

"পরিপক্ক অভিজ্ঞতা ব্যতীত এমন সুন্দর সহজপাঠ্য চিকিৎসা উপদেশ কেহ দিতে পারেন না।"

—নবশক্তি

* * *

"চিকিৎসকগণও এই বই-এ ভাবিবার জিনিষ পাইবেন। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"

—বঙ্গবাণী

* * *

"সাধারণ রোগসমূহের লক্ষণ ও কোন্ অবস্থায় কি ঔষধ দিতে হয়, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। বায়োকেমিক চিকিৎসার বিবরণও এক অধ্যায়ে দেওয়া আছে। পুস্তকখানির ছাপাই ও বাঁধাই ভাল।"

—প্রবাসী

* * *

"রোগের পরিচয় ও ঔষধের বিবরণ সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে এরূপ সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।"

—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

* * *

"আশা করি সাধারণের পক্ষে পুস্তকখানি হিতকরী হইবে।"

—স্বাস্থ্য-সমাচার

"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। সকলপ্রকার রোগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও তাহাদের ঔষধাদি বেশ সুন্দররূপে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।"

—মাসিক হোমিওপ্যাথিক পত্রিকা

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "প্রকৃতি" বলেন,—

"প্রচলিত হোমিওপ্যাথিক অন্যান্য পুস্তক হইতে এই বইখানির বিশেষত্ব এই যে, ইহার প্রথম কয়েক অধ্যায়ে সংক্ষেপে সরলভাবে বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জটিল তথ্য 'জীবাণু ও রোগ', 'অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি ও রো'গ সুন্দর বুঝান আছে। একটী অধ্যায়ে মনীষী ডাঃ সুসলারের বায়োকেমিক টিস্যু চিকিৎসার মত হোমিওপ্যাথিক মতের সহিত তুলনামূলকভাবে সন্নিবেশিত থাকায় বইখানি উভয় প্রণালীর চিকিৎসকগণের প্রণিধান-যোগ্য হইয়াছে। মহাত্মা হ্যানিম্যানের মতে রোগের প্রকৃতি কি এবং পুরাতন রোগের মূলগত কারণ ও চিকিৎসা খুব ভালভাবে দেওয়া আছে। বইখানি চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, অনুসন্ধিৎসু এবং সাধারণের পক্ষে সমান দরকারী।"

* * *

বইখানি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বহুদর্শী চিকিৎসক, মিহিজামের ডাঃ পরেশনাথ ব্যানার্জ্জী মহাশয় আগাগোড়া দেখিয়া দিয়াছেন।

এইরূপ ধরণের সম্পূর্ণ ও সুন্দর বই বাংলায় আর নাই। চিকিৎসকের পক্ষেও এই পুস্তক অপরিহার্য্য।

প্রকাশক—

মেসার্স আর, সি, দধি এণ্ড কোং

পোঃ মিহিজাম (ই, আই, আর)।

"কল্যাণের পথ ছাত্র ও যুবকগণের, শুধু তাই কেন, যাঁহারাই নিজেকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহেন তাঁহাদেরই পথনির্দ্দেশ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য ও সংযমের তপস্যা ভবিষ্যৎ কর্ম্মময় বৃহত্তর জীবনের পক্ষে কত বড় প্রয়োজনীয় তপস্যা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা ছাত্রদের হাতে "কল্যাণের পথ" দেখিলে সুখী হইব।"

—বাংলার বাণী—৭ই ভাদ্র, ১৩৩৫

"গ্রন্থখানি বাংলার তরুণ তরুণীকে পাঠ করিতে বলি—উহাতে ব্রহ্মচর্য্য লাভের প্রয়োজনীয়তা এবং কিরূপে উহাকে আয়ত্ত করা যায় তাহার বিস্তারিত নির্দ্দেশ আছে।······তিনি বিভীষিকাময় সন্ন্যাসবাদ (dismal asceticism) প্রচার করেন নাই, পরন্তু সঞ্জীবন ও স্বাস্থ্যের অনুকূল অমোঘ স্বাস্থ্যপ্রদ ব্রহ্মচর্য্য লাভের ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন। তরুণ বাংলা সে হিতবাণী শুনিবে কি?"

—স্বাস্থ্য-সমাচার—পৌষ, ১৩৩৭

প্রকাশক—

মেসার্স আর, সি, দধি এণ্ড কোং

পোঃ মিহিজাম,

(ই, আই, আর)